ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ।। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ১৪ জুন, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট

জাতীয় নিরাপত্তার প্রধান বিপদ ইসলাম

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সংসদে পেশ করা বার্ষিক রিপোর্টে জানিয়েছে, ভারতের ৩৫টি রাজ্যের মধ্যে ২৯টিই সন্ত্রাসবাদী উৎপীড়িত। সন্ত্রাসবাদীরা এইসব রাজ্যে যে কোনও উপায়ে নিজেদের কাজ হাসিল করতে পারে। নাগরিকদের ইচ্ছা ও হিতের বিরুদ্ধে তাদের যে কোনও কাজে বাধ্য করাতে পারে। এদেশে প্রতিমাসে জানা বা অজানা কমবেশি ৪০টি সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ঘটে চলেছে। এই কারণেই সম্প্রতি ইউ এস ন্যাশনাল কাউন্টার টেররইজম সেন্টার পাবলিকেশন তাদের প্রকাশিত 'এ ক্রোনোলজি অফ্ ইন্টারন্যাশনাল টেররইজম'-এ বলেছে—ভারত বিশ্বের অন্যান্য দেশের চাইতে সন্ত্রাসবাদী আক্রান্ত দেশ।

প্রধানমন্ত্রী মাওবাদী সন্ত্রাসকে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সবথেকে বড় বিপদ বললেও, ইসলামি সন্ত্রাসবাদ তার থেকেও ভয়ঙ্কর। দিল্লী থেকে প্রকাশিত ইংরাজী সাপ্তাহিক 'অর্গানাইজার'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যা (৬ জুন, ২০১০) 'ওয়াইপ আউট ইসলামিক টেরর' শীর্ষক এক নিবন্ধে ডঃ সুব্রহ্মনিয়ম স্বামী এই আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ২০১২ সাল নাগাদ তালিবানরা পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করবে এবং আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা নিজেদের গুটিয়ে নেবে। আর তখনই ইসলাম হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে উঠে পড়ে লাগবে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৪৭ সাল থেকে এযাবৎ এদেশে প্রতিটি হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা মুসলিম গুণ্ডাদের উস্কানিতে শুরু হয়েছে। প্রতিটি দাঙ্গার তদন্তের জন্য যেসব তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছে, তাদের রিপোর্ট খুঁটিয়ে পড়লেই এই

পি চিদাম্বরম

তথ্য উঠে আসবে। যদিও এইসব দাঙ্গাকে আজ সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম বলা হচ্ছে। এদেশে মুসলিমরা অপেক্ষাকৃত সংখ্যালঘু হলেও তাদের একাংশ এখনও হিন্দুদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর আক্রমণ করতে সাহস করে।

সীমান্তে বাংলাদেশী-জেএমবি গোষ্ঠীর তৎপরতা

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। পশ্চিমবঙ্গে তিন জেলায় জামাতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) কাজ করছে। পশ্চিমবঙ্গের এই তিনটি জেলা হচ্ছে মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও নদীয়া। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এই তিন জেলায় জেএমবির একশো এহসার (সার্বক্ষণিক সদস্য) আছে। দশ হাজারের মতো সমর্থকও তৈরি হয়েছে সেখানে। জেএমবি সাতটি মাদ্রাসাও তৈরি করেছে এই তিন জেলায়। জেএমবির আমির মওলানা সাইদুর রহমান পুলিশের কাছে আরও বলেছেন, তিনি জেএমবি'র ভারতীয় অংশেরও আমির। তবে মুর্শিদাবাদের সাঈদ ওই তিন জেলার সমন্বয়ক। বাংলাদেশ থেকেই অবশ্য সেখানকার কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই মুহূর্তে এই কাজে ভারতে আছেন জেএমবি'র শুরা সদস্য ও ঢাকা (উত্তর) বিভাগের প্রধান সোহেল মাহফুজ। জেএমবি আমিরের দাবি, জেএমবি-র কাজে ভারতে প্রশাসন খুব একটা ঝামেলা করে না।

নিষিদ্ধ জেএমবি-র আমির সাইদুর রহমান গত সপ্তাহে ঢাকায় ধরা পড়ার পর তাকে ছ'দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়।

জিজ্ঞাসাবাদে রহমান এসব তথ্য দিয়েছেন। তাকে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি), পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি), সিআইডি ও পুলিশ সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে

জেএমবি নেতা মহম্মদ আসাদুল্লা আল গালিব

গঠিত একটি দল জিজ্ঞাসাবাদ করছে। জেএমবি'র প্রতিষ্ঠাতা আমির শায়খ আবদুর রহমানও ২০০৬ সালে গ্রেপ্তারের পর জবানবন্দিতে বলেছিলেন, ২০০২ সালে বেলাল নামে এক জেএমবি নেতাকে দায়িত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় জেএমবি'র কাজকর্ম শুরু করা হয় এবং ৬৫তম সাংগঠনিক জেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশে মোট জেলার সংখ্যা ৬৪। ২০০৭ সালে তদারকি সরকারের সময় বিচারে শায়খ রহমানের ফাঁসি হয়। গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত সুপার জান্নাতুল হাসান সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, এর আগে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার হওয়া আবদুর রহিম শাহাদাত ভারতে জেএমবির তৎপরতা সম্পর্কে একই রকম তথ্য দেন। এই রহিম জেএমবির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি পরে জেএমবি ভেঙে 'ইসলাম ও মুসলিম' নামে নতুন জঙ্গি সংগঠন তৈরি করেন। পুলিশ সূত্র বলছে, গ্রেপ্তার হওয়া আরও কয়েকজন জঙ্গি নেতা ইতিপূর্বে পুলিশের কাছে ভারতের সীমান্ত জেলাগুলোতে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনগুলোর তৎপরতা সম্পর্কে একই ধরনের তথ্য দিয়েছেন।

মওলানা সাইদুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদে আরও তথ্য মিলেছে, নিষিদ্ধ তিন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), হিযবুত তাহবির ও হরকাতুল জিহাদ (হুজি) শিগগিরই এক হয়ে

(এরপর ৪ পাতায়)

অনুপ্রবেশের শাস্তি

"উত্তর কোরিয়া এরকম অনুপ্রবেশকারীদের বারো বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়, ইরান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী করে রাখে, আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশকারীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সৌদি আরব জেলে পোরে, চীনে বেআইনীভাবে কেউ ঢুকলে তাকে আর পাওয়া যায় না। কানাডা তিন বছর এবং ফ্রান্স পাঁচবছর জেলে বন্দী করে রাখে। ভেনিজুয়েলা তাদেরকে কিমা মশলা (স্পাইস) বানিয়ে তাদের চিরতরে শেষ করে দেয়। মেক্সিকো এবং কিউবা জেলে ভরে রাখে।"

ভারত কি করবে?
সবিস্তার পৃষ্ঠা - ৯

গহনা যদি গড়াতে চান
যে কোনও স্বর্ণকারকে
সুপার
ক্যাটলগ দেখাতে বলুন
সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক এণ্ড সন্স
১৫-ডি, গরাণহাটা স্ট্রীট, কলি-৬

ক্ষমতাসীন কমিউনিস্টরা সংসদীয় গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী

গুঢ়পুরুষ।। আর কীভাবে এবং কতবার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানাবে যে বামফ্রন্ট সরকারের আর দরকার নেই? সেই ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে ২০০৯-এর লোকসভার নির্বাচন এবং বিধানসভার কিছু আসনে উপনির্বাচনে রাজ্যের ভোটদাতারা সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন বামফ্রন্টের উপর তাঁদের আস্থা নেই। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তন চাইছেন। এই অবস্থায় যে কোনও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলই জনাদেশ মাথায় নিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। ভারতের অন্য রাজ্যে এমনটি হলে তাই হোত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন কম্যুনিস্টরা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না।

কম্যুনিস্টদের তত্ত্বে সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ আদতে একটি সাময়িক রাজনৈতিক কৌশল। একমাত্র রক্তাক্ত বিপ্লবের পথেই সর্বহারাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা যায়। মার্কসবাদী সিপিএম গণতন্ত্র-নির্বাচনের এই রাজনৈতিক কৌশলের পথেই চলছে বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে নিয়ে। কম্যুনিস্টদের অন্য একটি বড় অংশ সরাসরি অস্ত্র হাতে লড়াইয়ে নেমেছে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে। তারাই সংবাদমাধ্যমের দৌলতে 'মাওবাদী' নামে পরিচিত। যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে নিরস্ত্র দরিদ্র নিরন্ন মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা। সন্ত্রাসের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের আনুগত্য আদায় করা। একদা মধ্যযুগে ভারতে মুসলিম হানাদার শাসকরা যেভাবে ক্ষমতা ও আনুগত্য আদায় করেছিল। সেই মধ্যযুগীয় পথই মাওবাদীরা অনুসরণ করছে।

তবু বলবো মাওবাদীদের থেকে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা বেশি বিপজ্জনক। কারণ, মার্কসবাদীরা গণতন্ত্রের মুখোশ পরে আত্মস্বরূপ গোপন করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ছদ্মবেশী শত্রু সর্বদাই বেশি বিপজ্জনক। সিপিএম যদি সংসদীয় গণতন্ত্রে আস্থা রাখতো তবে পুরসভার ভোটের পর জনাদেশ মাথায় নিয়ে বিধানসভার নির্বাচন আগাম করার জন্য দেশের নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানাতো। সেই অনুরোধ কমিশন গ্রহণ না করলেও সিপিএম দলের মর্যাদা বৃদ্ধি পেত। এমনকী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বহু মানুষ যাঁরা এখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন তাঁরা পার্টির প্রতি হারানো আস্থা ফিরে পেতেন। আখেরে লাভ হোত পার্টির। কিন্তু কথায় আছে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়। বিমানবাবু-বুদ্ধবাবুদের তাই হয়েছে। আরও দশ-এগারো মাস ক্ষমতা আঁকড়ে থেকে তাঁরা এমন কি চমক দেখাবেন যে জনমত তাঁদের দিকে বিপুলভাবে ঘুরে যাবে? বরং ঠিক উল্টোটাই হবে। তিন দশক ধরে গড়ে তোলা তাদের বিশ্বস্ত আমলাকুল পরিস্থিতি বুঝে এখন রং, আনুগত্য সবই পাল্টাবে। আমলারা আদতে হাওয়া মোরগ। হাওয়া যেদিকে তারা সেদিকেই ঘুরবে। গোপনে তারা মমতা এবং তাঁর দলের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। মুখ্যমন্ত্রী থেকে ছোট-বড় সব মন্ত্রীই সাক্ষী গোপালের মতো নিশ্চল পাথরের মূর্তি হয়েই মহাকরণের ঠাণ্ডা ঘরে বসে থাকবেন।

সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের মন্ত্রীসভার শেষ বছরে এমনটিই ঘটতে দেখেছি। চোখ বন্ধ করে বলতে পারি সেই দশাই ঘটতে চলছে এবার বামফ্রন্টের মন্ত্রীদের। মন্ত্রীদের কোনও নির্দেশ আমলারা মানিবে না। পুলিশের উপরতলা থেকে নিচতলা পর্যন্ত পার্টির নেতাদের পাত্তা দেবে না। প্রয়োজনে অপমান

(এরপর ৪ পাতায়)

মুসলিম সংরক্ষণেই ধরাশায়ী সিপিএম – তোগাড়িয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মুসলিমদের সংরক্ষণ দেওয়ার জন্যই পুরভোটে সিপিএমের বিপর্যয় ঘটেছে। গত ৫ জুন খড়্গপুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অর্ন্তরাষ্ট্রীয় মহাসচিব প্রবীন তোগাড়িয়া এই মন্তব্য করেন। খড়্গপুরের কাছে গোপালী আশ্রমে বিশ্বহিন্দু পরিষদের এক প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিতে তিনি এসেছিলেন। এই শিবির ২৯ মে শুরু হয়েছে এবং ১৩ জুন শেষ হবে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ১০৫ জন শিক্ষার্থী হিসাবে এই প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫ জন মহিলা।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রী তোগাড়িয়া বলেন, মুসলিমদের সংরক্ষণ দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুরা বামফ্রন্টের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সংরক্ষণ প্রত্যাহার না করলে আগামী বিধানসভা

(এরপর ৪ পাতায়)

পরিবর্তনের ঝড়েও পুরভোটে উল্লেখযোগ্য সাফল্য বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রবল ভোট-মেরুকরণের বাজারেও নিজস্ব ভোট-ব্যাঙ্ক অটুট রাখল বিজেপি। এর মধ্যে কলকাতা পুরসভায় আশাতীত ভাল ফল করেছে তারা। গতবারের জেতা দু'টি আসন ধরে রাখার পাশাপাশি একটি আসন বাড়িয়েও নিয়েছে। রাজ্যের নিরীখে মোট ৬টি পুরসভায় ১২ জন বিজেপি প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। কলকাতা বাদে অন্যান্য পুরসভাগুলির মধ্যে রয়েছে ইংলিশবাজার, বেলডাঙ্গা, রামজীবনপুর, খড়্গপুর ও রামপুরহাট। ইংলিশবাজার পুরসভায় এবার পর্যুদস্ত হয়েছে সিপিএম। কংগ্রেস আর তৃণমূলের জোট না হওয়ায় বোর্ডের অবস্থা ত্রিশঙ্কু। সেক্ষেত্রে ইংলিশবাজার পুরবোর্ড গড়ার সময় নির্ণায়কের ভূমিকায় দেখা যেতে পারে বিজেপি-কে।

তৃণমূলের প্রবল হাওয়ার মধ্যেও কলকাতা পুরসভায় বেশ ভাল ফল করেছে বিজেপি। তাদের জেতা দুটি আসন (২২ নম্বর ওয়ার্ড ও ৪২ নম্বর ওয়ার্ড)-এ পাত্তাই পায়নি তৃণমূল। যেমন ২২ নম্বর ওয়ার্ডটি ছিল পুরসভার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র মীনাদেবী পুরোহিতের ওয়ার্ড। নিঃসন্দেহে হেভিওয়েট প্রার্থী। তিনি গতবারের মতো প্রত্যেকটি বুথে এগিয়ে থেকে সবমিলিয়ে ৩৯৫৬টি ভোট পান। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের সুনীতা সিং পান মাত্র ৭৩২টি ভোট, সিপিএমের মিতা বান্ধাওয়াতের ভাগ্যে জোটে ৪৬২টি। অন্যদিকে বিজেপি-র গতবারের জয়ী কাউন্সিলার সুনীতা ঝাওয়ার তাঁর ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে পেয়েছেন ৩৬১৫টি ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের রাজেশ কুমার সিনহা-র কপালে জুটেছে ৯৯৩টি ভোট। আর বামফ্রন্ট মনোনীত আর জে ডি প্রার্থী ওই ওয়ার্ডে পেয়েছেন মাত্র ৯৮টি ভোট। এই দু'টি ওয়ার্ড ছাড়াও কলকাতা পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছেন বিজেপি-র বিজয় ওঝা।

বেলডাঙ্গায় কংগ্রেসের তীব্র চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে একটি আসনে জেতে বিজেপি, অন্যদিকে রামজীবনপুরেও পুরসভার ফলের ভিত্তিতে ত্রিশঙ্কু হয়ে পড়েছে পুরবোর্ড। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন বিজেপি-র দুই কাউন্সিলার। খড়্গপুরে তীব্র 'বিরোধী হাওয়া'র মধ্যেও জেতেন বিজেপি প্রার্থী। রামপুরহাট পুরসভারও ত্রিশঙ্কু দশা। বিজেপি-র দু'জন কাউন্সিলার রয়েছেন সেখানে। প্রসঙ্গত রাজ্যে কলকাতা পুরসভা সহ ৮১টি পুরসভার নির্বাচনে তৃণমূল একক ভাবে ক্ষমতা দখল করতে চলেছে ২৯টি পুরসভায়, কংগ্রেস ৭টি-তে, বামফ্রন্ট-১৭টি-তে, আর ত্রিশঙ্কু অবস্থা ২৮টি পুরসভায়। অবশ্য তৃণমূল-কংগ্রেস অথবা বিরোধী জোট হলে এর সিংহভাগই বিরোধীদের দখলে চলে আসবে।

সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, এই পরিবর্তনের ঝড়েও রামপুরহাট পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী মাত্র ৯টি ভোট পেয়েছেন। যে ওয়ার্ডের বাসিন্দা রামপুরহাটের বিধায়ক তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি আশীষ ব্যানার্জী। ওই ওয়ার্ডে বিপুলভাবে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী। এই বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন হচ্ছে— একটা সময় পরিবর্তনের ঝড়ের গতি স্তিমিত হলে উঠবে বিজেপি-আঁধি।

মীনাদেবী পুরোহিত

বিজয় ওঝা

সুনীতা ঝাওয়ার

পুরনির্বাচনে বিজেপি

পুরসভার নাম	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
কলকাতা	৩
ইংলিশবাজার	৩
বেলডাঙ্গা	১
রামজীবনপুর	২
খড়্গপুর	১
রামপুরহাট	২

দায়ে পড়ে কেরলে হিন্দু তাস খেলছে সি পি এম

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ঠেলার নাম যে বাবাজী হতে পারে, সেটা প্রকাশ কারাটের রাজ্যের সিপিআই (এম)-কে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। বিগত দু'দশক ধরে কেরলে, তাদের জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মুসলিমদের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতাই রেখে চলছিল কম্যুনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব। জামাতে ইসলামীর মতো কট্টর জেহাদী সংগঠনও এতদিন তাদের চোখে মোটেই খারাপ ছিল না। কিন্তু আচমকাই পার্টির কেরলের সম্পাদক পিনারাই বিজয়ন তোপ দাগতে শুরু করেছেন জামাত নেতাদের বিরুদ্ধে। এমনকী জামাত সংগঠনটির ধ্বংসাত্মক মনোভাব সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে একাধিক প্রেস কনফারেন্স এবং প্রকাশ্যে বক্তৃতাও করেন তিনি। অন্যদিকে মন্ত্রিসভায় বিজয়নের সহকর্মী ও কেরলের গৃহ-মন্ত্রী কোদিয়ারি বালাকৃষ্ণণ মন্তব্য করেছেন, জামাত-এ-ইসলামি মৌলবাদী আদর্শ প্রচার করছে রাজ্যজুড়ে। তিনি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরকে এবিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দেখবার জন্য অনুরোধ করেছেন এবং জাতীয়স্তরে এই মৌলবাদী সংগঠন'টির গতিবিধি রীতিমতো 'সন্দেহ-জনক' বলে দাবি করেছেন। এতকাল এই ধরনের কথা-বার্তা বিজেপি-র মুখে শুনতেই অভ্যস্ত ছিল দিল্লীর রাজনীতিবিদরা। কিন্তু কেরলের সিপিএম পার্টি নেতৃত্বের এহেন বিবৃতি শুধুমাত্র জাতীয় স্তরে সিপিএম-কেই বিপদে ফেলেনি, মুসলমানদের জন্য ভজনা গাওয়া রাজনীতিবিদদেরও বেশ বিপাকে ফেলেছে। বিপদে পড়েছে সিপিএমের বেঙ্গল লাইনও। এতকাল বেশ সংরক্ষণের ভুজুং-ভাজুং, এটা-সেটা করে পশ্চিমবঙ্গে উর্দুভাষী মুসলিমদের একাংশের ভোট-ম্যানেজ করার চেষ্টা করে আসছিল সিপিএম। কারণ বাঙালীভাষী মুসলিমদের ভোট তো গত লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই তৃণমূলের খপ্পরে গিয়েছিল। তাই সোনিয়া-প্রণবদের বাক্সে যাবার পর যে ছিটে-ফোঁটা উর্দুভাষী মুসলিম ভোট সিপিএমের জন্য পড়ে থাকতে পারতো, কেরলে পার্টির এরকম খুল্লাম-খুল্লা আক্রমণের পর সেই উচ্ছিষ্টটুকুও আর পাওয়া যাবে না বলে বেঙ্গল-লাইনের আশঙ্কা।

আসলে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ থমাস আইজ্যাকের ওপর সঙ্ঘবদ্ধভাবে কিছু মুসলিম দুষ্কৃতী হামলা চালায়। সেই হামলার পূর্বে আইজ্যাক প্রকাশ্যে বলেছিলেন— 'জামাতে ইসলামী রাজ্যে মৌলবাদী চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিতে প্রচার চালাচ্ছে। জনগণের উচিত তাদের গতিবিধি ও কার্যাবলীর ওপর সতর্ক নজর রাখা।' থমাসের এই ধরনের মন্তব্যের ফলে এই হামলা বলে পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণ পেয়েছে।

তবে সিপিএম যেভাবে জামাত বিরোধী

পিনারাই বিজয়ন

নাতিসেন

হয়ে উঠেছে তা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের রীতিমতো অবাক করছে। কারণ কয়েকদিন আগে পর্যন্ত সিপিএম নেতারা জামাতের সঙ্গে একমঞ্চে ভাষণ দিতেন। এখন সেই জামাতের আদর্শবাদকে 'উগ্র সাম্প্রদায়িক' বলে বর্ণনা করছে সিপিএম। অথচ এতদিন এই আদর্শবাদের কথাই ঢ্যারা পিটিয়ে প্রচার করেছিল তারা।

(এরপর ৪ পাতায়)

এই সময়

শিবরাজের কুকীর্তি

সংসদ-ভবন হামলার ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত আফজল গুরুর ক্ষমা-ভিক্ষার আবেদন নাকচ করা নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে টালবাহানা করেছিল ইউ পি এ-১ সরকারের শিবরাজ পাতিলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ স্বীকার করে নিলেন দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেত্রী শীলা দীক্ষিত। একটি টিভি চ্যানেলকে সাক্ষাৎকার দিতে এসে, ক্ষমা-ভিক্ষার আবেদন নিয়ে অহেতুক টালবাহানার পেছনে শিবরাজের কতটা হাত ছিল এপ্রশ্নে প্রথম চুপ করে থেকে শীলা বুঝিয়ে দেন, 'মৌনং সম্মতিং লক্ষণম্।' পরে সাক্ষাৎকারককে বলেন, 'আপনি যা ভাবছেন, তা বোধহয় সঠিক।'

ভরসা সুধীজনেই

রাজনীতিবিদদের ওপর থেকে যে মানুষের আস্থা পুরোপুরি উবে গেছে, তা সম্যক উপলব্ধি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোনিয়া গান্ধী। তাই বিধাননগর এবং কলকাতা পুরসভা পরিচালনার জন্য মমতা যখন সুবিশাল বিদগ্ধজনের বিশেষজ্ঞ দল গড়ছেন, তখন দিল্লীতে সোনিয়া গান্ধীর পছন্দের সমাজ-কর্মী ও সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত চৌদ্দ জন ব্যক্তিকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ন্যাশানাল অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল গঠন করল। মমতার কলকাতা বিশেষজ্ঞ কমিটি-তে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মতো যাও বা দু' একজন রাজনীতির লোক ঠাঁই পেয়েছে, সোনিয়ার জাতীয় পরামর্শদাতা সমিতিতে কিন্তু একজন রাজনীতিবিদেরও ঠাঁই হয়নি।

অসুখী জীবন

প্রতিনিয়ত সংগ্রাম আর বাঁচার লড়াই জীবনের তাগিদটা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। মুম্বাইয়ের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ টেকনোলজির সমীক্ষকগণ সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, অধিকাংশ ভারতীয়-ই তাঁদের জীবন নিয়ে অসুখী। সেখানকার হিউম্যানিটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মীনাক্ষী গুপ্তের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই সমীক্ষার অন্যতম সমীক্ষক তিথি ভাটনগর জানাচ্ছেন—দীর্ঘ সাত বছর ধরে পাঁচ থেকে বিরানব্বই বছর বয়সী ২৬০০ জন মানুষের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে তাঁরা ওই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

বাপরে! কী বিষম বৃদ্ধি

সেদিন ডালহৌসির মোড়ে জনৈক সরকারী কর্মী রীতিমতো গজগজ করছিলেন। তাঁর বক্তব্য—'ষষ্ঠ বেতন কমিশন আমাদের মাইনে বাড়িয়েছে বলে তার সমালোচনা হচ্ছে। অথচ সাংসদদের মাইনে যে একলাফে পাঁচগুণ বাড়তে চলেছে। তার বেলা?' হক কথা। যে সাংসদ আজকে মাইনে পাচ্ছেন মোটে ১৬,০০০ টাকা, আগামীদিনে তিনিই পাবেন ৮০,০০০ টাকা। লোকসভা আর রাজ্যসভার যৌথ কমিটির এহেন সুপারিশ আপাতত সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রকের বিবেচনাধীন রয়েছে। এটি কার্যকর হলে শুধুমাত্র মাইনেই নয়, সাংসদদের দৈনিক ভাতাও হবে দ্বিগুণ, টেলিফোনের খরচ হিসেবেও অতিরিক্ত হাজার পঞ্চাশেক টাকা পাবেন তাঁরা। বিনা পয়সায় বিমানে ভ্রমণের পাশাপাশি, এমনকী ট্রেনে ভ্রমণ করলে বিমানভাড়ার অতিরিক্ত পঁচিশ শতাংশ দাবী করার (সরকারের কাছ থেকে) অধিকারী হবেন সাংসদরা!

এস এম এস-এ নবজাতক

নিঃসন্দেহে অভিনব উদ্যোগ। মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধায় ৯৯০টি গ্রামকে নিয়ে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে চালু হয়েছে জীবনদায়ী প্রকল্প। সেই প্রকল্প অনুসারে, এস এম এস ভিত্তিক শিশু জন্মানোর পূর্বেই গর্ভজাতকের পরিসংখ্যান নিয়ে এস এম এস ভিত্তিক একটি ডেটা-বেস তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনও মহিলা গর্ভবতী হলে সেই খবর পৌঁছে যাবে ওয়ার্ধা জেলাপরিষদের দপ্তরে। যে প্রক্রিয়ায় এটি পৌঁছবে তার নাম অক্সিলারি নার্স মিডওয়াইভস (এ এন এম এস)। এতে করে সংশ্লিষ্ট মহিলার প্রেগনেন্সির গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলি এস এম এসের মাধ্যমে চলে আসবে জেলা পরিষদের দপ্তরে। তারপরই তারা গর্ভবতী মহিলার স্বাস্থ্য-পরীক্ষাসহ অন্যান্য কর্মসূচী পালন করবে।

তেলের দাম বাড়ছেই

তেলের মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। তেল মানে অবশ্যই জ্বালানী তেল, কারণ বার্ষিক ৭০,০০০ কোটি টাকার ঘাটতি আর টানতে পারছে না ইউ পি এ-দুই সরকার। সেই কারণে লিটার প্রতি পেট্রলের সাড়ে চার টাকা আর ডিজেলের দু'টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভার কোর কমিটি। যে কমিটির মাথায় রয়েছেন স্বয়ং অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। সেই সাথে কেরোসিনের মূল্যও লিটার প্রতি সাড়ে পাঁচ টাকা বৃদ্ধি এবং চলতি দামে পরিবার পিছু পাঁচটি ভর্তুকিওলা রান্নার এল পি জি গ্যাস দেওয়ার চিন্তাভাবনাও রয়েছে ক্ষমতাসীন মন্ত্রিগোষ্ঠীর মাথায়।

ক্ষতিপূরণ

ম্যাঙ্গালোর প্লেন দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ দিল এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ। সব মিলিয়ে ১২৯ জন ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ দিতে ওই বিমান-সংস্থাটির খরচ হয়েছে ১১.২৯ কোটি টাকা। ১২ বছরের অধিক নিহতদের পরিবারকে দশ লক্ষ টাকা করে এবং বাকিদের পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। আহতদের ক্ষতিপূরণ জুটেছে দু'লক্ষ টাকা করে। প্রসঙ্গত, ম্যাঙ্গালোর বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলেও জমা পড়েছিল ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে সেই টাকারও সদব্যবহার করেছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ।

দায় স্বীকার

পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন আফগানিস্তানের গৃহমন্ত্রী হানিফ আটমার এবং গোয়েন্দা-প্রধান আমরুল্লা সালহে। গত ৬ জুন পদত্যাগ করলেন তাঁরা। বেশ কিছুদিন ধরেই আফগান নিরাপত্তা বাহিনীতে জেহাদী জঙ্গিরা ঢুকে পড়ছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। যার সত্যতা কিছুটা প্রমাণিত হয়, মে মাসের শেষদিকে শান্তি-সম্মেলন (পীস কনফারেন্স)-এ সন্ত্রাসবাদী হানা এবং ওই হানার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীর গাফিলতি এবং অপদার্থতাকেই দায়ী করা হয়। মূলত এই প্রেক্ষিতেই ওই দু'জনের পদত্যাগ বলে মনে করা হচ্ছে। আফগান প্রেসিডেন্টের কার্যালয় বলছে, হামিদ কারজাই, হানিফ ও আমরুল্লার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মনমোহনী অর্থনীতি

কেন্দ্রের কংগ্রেস-চালিত ইউপিএ সরকার ক্রমশই তাহার খোলস ছাড়িয়া বাহির হইতে শুরু করিয়াছে। প্রথমবার ক্ষমতায় আসীন হইয়াই ইউপিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর মুখে লম্বা চওড়া বচন আওড়াইয়াছিল যে এই সরকারের উন্নয়নের লক্ষ্য হইবে মানুষ অর্থাৎ মানবমুখী উন্নয়নই তাহার সরকারের উদ্দেশ্য হইবে। কিন্তু উন্নয়ন মানেই যেখানে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নই অগ্রগতির একমাত্র মাপকাঠি।

কিন্তু মনমোহনজীর অর্থনৈতিক পদক্ষেপে সব সময়েই যে মানবমুখীনতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা নয়। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির শেয়ার বিক্রয়ের নানা ছলচাতুরি তো আছেই, আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নানান অপমানজনক গোপন চুক্তি,ডব্লু.টি.ও'র কাছে অহেতুক আত্মসমর্পণ;ফলস্বরূপ দেশের বাজার ছাইয়া গিয়াছে আমদানি শুল্কহীন স্বল্পমূল্যের দ্রব্যে। ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষির অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে মৃতপ্রায়। বিদেশী মূলধন সরাসরি বিনিয়োগ হইবার সুযোগ মেলায় শেয়ার বাজার প্রায় বিদেশী বণিকদের হস্তে চলিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে।

ইহার সহিত আবার যুক্ত হইয়াছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দেশের ব্যাঙ্কগুলির বিনিয়োগ যোগ্য মূলধনের উপর নিয়ন্ত্রণ। বিদেশী মূলধনে দেশ ভরিয়া তোলা হইতেছে, অপরদিকে দেশের ব্যাঙ্কগুলিকে আভ্যন্তরীণ মূলধন সংগ্রহে বাধা দেওয়া হইতেছে। অজুহাত হইল—প্রমোটারদের দেওয়া গৃহঋণের উপর সুদ বৃদ্ধি করা যাইবে না। ব্যাঙ্ক ঋণ যদি দিতে বাধ্য হয় কম সুদে, তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবেই জমার উপর সুদ বাড়াইতে পারিবে না। জমার উপর সুদ না বাড়াইলে মানুষ ব্যাঙ্কে অর্থ জমানোতে কেমন করিয়া আকৃষ্ট হইবে?

ইহার বলস্বরূপ বাজারে চলিয়াছে বেআইনি টাকার লেনদেন, ব্যাঙ্কের ভাণ্ডার পরিমিত নয়—এই অজুহাতে ইউপিএ সরকার ইতিমধ্যেই বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডারের দ্বারস্থ হইয়াছে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি, নিত্য পণ্যদ্রব্যের যথেচ্ছ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াই চলিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যেন হালই ছাড়িয়া দিয়াছে। বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার নিশ্চয়ই কোনও শর্ত দিয়াছে। তাহার দেওয়া ঋণ কয়েকটি সরকারী ব্যাংকের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইতেছে যাহাতে সেই অর্থ ফুরিয়া ব্যবসায়ীদেরই হাতে আসিতে পারে। নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্যের উপর কোনমতেই যেন ভর্তুকি দেওয়া না হয়।

এই গোপন চুক্তিরই প্রতিফলনই আমরা এখন যেন দেখিতেছি পেট্রল, ডিজেল ও কেরোসিনের মূল্য-বৃদ্ধি জনিত সরকারি আচার-আচরণে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাবভাবে যেন কেমন একটা অসহায় অবস্থাই প্রকাশ পাইতেছে। পেট্রল, ডিজেলের দাম তো দু-একমাস অন্তরই বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু এবার কেরোসিনও বাদ যাইতেছে না। দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীমণ্ডলীর বৈঠক হইয়া গিয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই রেলমন্ত্রী সেই বৈঠকে গরহাজির থাকিয়াছেন। তাহার কণ্ঠে ২০১১ সাল পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার কাঁটা হইয়া ঝুলিতেছে। তাহার পক্ষে ২০১১ সালের বৈতরণী পার না হওয়া পর্যন্ত এই মূল্য বৃদ্ধিতে সায় দেওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। এই সত্য পশ্চিবঙ্গের আপামর জনগণেরই জানা। বামপন্থীরা যেমন মমতার গলার কাঁটা; মমতাও ঠিক তেমনই ইউপিএ সরকারের পথের কাঁটা। মমতাকে ছাড়িয়া কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে অপদস্থ হইয়াছে অতি সম্প্রতি, তাহাতে পুনরায় মমতাকে চটানো কংগ্রেসের পক্ষে কতটা সম্ভব হইবে ভবিষ্যতই বলিতে পারিবে। আর মমতাকে এড়াইয়া যাওয়াও সম্ভব নয়, কারণ এই দাম বাড়ানোর তথাকথিত মন্ত্রী গোষ্ঠীর তিনিও যে একজন সদস্য।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

কোনও একটি মতবাদই মানব প্রগতির শেষ কথা এইরূপ চিন্তা করা নির্বুদ্ধি তার পরিচায়ক। দর্শনের ছাত্র হিসাবে, আপনারা স্বীকার করিবেন যে, মানব প্রগতি রুদ্ধ হইতে পারে না। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতেই পৃথিবীতে নবতম মতবাদ জন্মগ্রহণ করে। সেই জন্যই ভারতবর্ষে আমরা ওইসব পরস্পর বিরোধী মতবাদগুলির ভাল অংশগুলি গ্রহণ করিয়া একটি সমন্বয়ী প্রথা প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিব। জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যে ভাল অংশগুলির একটা তুলনা করতে চাই। উভয় মতবাদকেই গণতন্ত্রবিরোধী ও এক নায়কত্বের দোষে অভিহিত করা হয়। উভয়েই ধনতন্ত্র বিরোধী, এইসব ঐক্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে বিরোধ প্রচুর, ইউরোপ জাতীয় ঐক্য ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই প্রথা ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক কাঠামোর গলদ সম্পূর্ণ দূর করতে পারে নাই।

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

আদিবাসীদের চোখের চল বুদ্ধ দেব প্রশাসনের কানে কবে ঠুকবে ?

রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

সাঁওতাল পরগণার সীমান্তে বীরভূম জেলার বিভিন্ন গ্রামে সাঁওতালদের বাস স্মরণাতীত কাল থেকে। তারাই ভূমিপুত্র—সহজ, সরল, অল্পে সন্তুষ্ট শান্তিপ্রিয় মানুষগুলি আমাদের আরণ্য সভ্যতার সম্পদ। বীরভূমের ওই সব জমি ঊষর, ফসল তেমন হয় না, সেই অল্প উৎপাদনেই খুশী মানুষগুলো। ঊষর জমিগুলিতে অভিশাপের মতো আছে কিছু ব্যাসল্ট পাথরের অনুচ্চ পাহাড়। ওই পাহাড়গুলিই এখন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে নির্লোভ সাঁওতালদের জীবনে। ওই অনুচ্চ পাহাড়গুলি ভেঙে হাজার হাজার লরী ভর্তি করে ইমারতী দ্রব্য হিসাবে পাথরের টুকরো আসছে শহরগুলিতে; তৈরী হচ্ছে আকাশচুম্বী অট্টালিকা। মহম্মদবাজার ব্লকে পাথর কুচি সরবরাহের জন্য আছে ১৫০টি খাদান ও ১২০০ পাথর ভাঙার যন্ত্র। করগোণা কয়েকজন বাদ দিলে এইসব কারবারের মালিক মুসলমান। বছর চল্লিশ আগে এই কারবার করতো সিন্ধীরা। এই কারবার আইনী নয়—আইন অনুযায়ী সাঁওতাল আদিবাসীদের জমি কেনা যায় না;খাদান ও ক্রাশারগুলি সাঁওতালদের জমি লিজ নিয়ে তৈরি; কখনও বা সাঁওতাল বউ বা তার সন্তানের নামে কেনা জমিতে—যেটা সিন্ধীদের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। সিন্ধীরা হটে গেছে নানা কারণে; বিশেষত পরিবেশবিধি ও নানান সরকারী নিয়ম-কানুনের চাপে। তাদের জায়গায় চলে এসেছে কিছু উদ্যোগী মুসলমান—যারা কোনও কিছুতেই পিছপা নয়। খাদান ও ক্রাশারগুলির মধ্যে মাত্র ৩৫টি খাদান ও ২৩১টি ক্রাশার লাইসেন্সপ্রাপ্ত। এগুলিও যে পরিবেশ বিধি ও অন্যান্য সরকারী বিধি মেনে চলে, এমন ব্যাপার নয়। টাকায় কাঠের পুতুলেও জল খায়। কাঠের পুতুল অনেক—থানা-পুলিশ ও তাদের ওপরওয়ালা, পরিবেশ দপ্তর, ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ দপ্তর, পঞ্চায়েত, শ্রম, আরও কতো দপ্তর। তার সঙ্গে ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলের হাঙ্গররা। খাদান ও ক্রাশার মালিকরা মুর্শিদাবাদ থেকে এনেছে মুসলিম ম্যানেজার, সুপারভাইজার, লেবার কনট্রাক্টর ও বিশাল সংখ্যক মুসলিম শ্রমিক। এইসব খাদান-ক্রাশার মালিকদের নেতা হচ্ছে শেখ কামাল খাঁ, একসময়ের ছোটখাটো মাস্তান। এখন কামাল তিনটি খাদান ও অনেকগুলি ক্রাশারের মালিক। মহাশ্বেতা দেবী দৈনিক স্টেটসম্যান-এ একটি নিবন্ধে একেই কমল খান বলে লিখেছেন, যাতে পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারে; কমল খান তো হিন্দুর নামও হতে পারে। পাহাড় ভাঙার জন্য ডিনামাইট দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে হয়;পাথর ছিটকে হামেশাই সাঁওতাল গ্রামবাসীদের মাটির বাড়ি ভেঙে দেয়। মাঝে মাঝে জীবনহানিও হয়। বিগত ফেব্রুয়ারি মাসে কামাল খাঁ-র খাদান থেকে পাথর ছিটকে আদিবাসীদের বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই নিয়ে প্রচুর ঝামেলাও হয়—যা মহাশ্বেতা দেবী ওই নিবন্ধে লিখেছেন। কিন্তু এবারের ঘটনা প্রকারের দিক দিয়ে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। মুহম্মদবাজার নলহাটি ও পাকুড়ের পাথরকুচি ব্যবসা বহু হাজার কোটি টাকার ও বহু মানুষের রুজির। খাদান ও ক্রাশারকে কেন্দ্র করে জমা হওয়া এইসব মানুষদের আদিম ক্ষুধা মেটানোর দায়টাও পড়ে গ্রামের সহজ সরল সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী কালো হরিণ চোখ মেয়েদের। কখনও জোর করে, কখনও মত্ত করে, কখনও প্রেমের ফাঁদে ফেলে খাদান-ক্রাশার মালিকরা এদের দিয়ে নিজেদের আদিম ক্ষুধা মেটায়। এ ব্যাপারে একেবারে চোখ মুদে থাকে প্রশাসন। সহায়হীন এইসব আদিবাসীদের ক্ষেত্রে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। এবারের গণ্ডগোলটা সেই নিয়ে। গ্রামের মেয়েদের ইজ্জত রক্ষার জন্য আদীবাসীরা নিয়ম করেছিল সন্ধ্যার পর বাইরের কেউ আদিবাসী গ্রামে ঢুকতে পারবে না। কিন্তু বহু লম্পট এই নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চলতো। এমনই একজন হলো মুসলিম-গরিষ্ঠ কাপাসডাঙ্গার বসিরুল শেখ। বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও তাকে রাত্রে বারোমেসিয়া গ্রামে দেখা যেত। ১৯ এপ্রিল মধ্যরাত্রে বসিরুলকে কু-কর্মরত অবস্থায় দেখা যায়। দেবু সোরেন নামে একজন কুড়ুল দিয়ে আঘাত হানে বসিরুলের কাঁধে। সেখানেই মৃত্যু ঘটে বসিরুলের। পরে পুলিশ বসিরুলের দেহ উদ্ধার করে পোষ্টমর্টেম করে ক্রাশার মালিকদের ফেরত দেয়। মালিকদের সংগঠন বোঝে আদিবাসীরা এই ধরণের প্রতিবাদী হলে তাদের আর দমিয়ে রাখা যাবে না। সুতরাং তারা পাল্টা আঘাত হানতে চক্রান্ত করে। ২১ এপ্রিল সারাদিন মাইকে করে 'স্মরণ শোভাযাত্রা'র কথা প্রচার করে। ২২ এপ্রিল সেই 'স্মরণ শোভাযাত্রা'য় জমা হয় বহু বাইরের লোক। এদের বহুজনের কাছেই পিস্তল-রিভলবার ছিল। এদের নেতৃত্ব দেয় কামাল খাঁ, নাজির হোসেন মল্লিক, মুশারফ খাঁ, সালাউদ্দিন, আজিম শেখ ও অন্যান্যরা। গুণ্ডাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে লোকদেখানী পুলিশের ভ্যানও ছিল। ওই শোভাযাত্রা ধ্বংসের আগুন ছড়িয়ে ছুটি আদিবাসী গ্রাম—সাগরবান্ধি, ছান্দা, পাচামী, নতুনগ্রাম, মোথ্রপাহাড়ী ও হার্মাডাঙ্গা প্রদক্ষিণ করে। দুর্ভাগ্যবশত, ওই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিল সম্প্রদায়-প্রেমিক কিছু সাধারণ শ্রমিকও। শোভাযাত্রাকারীদের সংখ্যা মহাশ্বেতা দেবীর নিবন্ধ অনুযায়ী একশো পঞ্চাশ নয়—তার অনেক বেশী। সঙ্গের পুলিশ তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি বা চায়নি। ফলে গ্রাম জ্বালানোর সঙ্গে ব্যাপক লুটপাট হয়েছে। হয়েছে ব্যাপক মারধোর ও ধর্ষণ। গরীব মানুষদের যাবতীয় গবাদি পশু তো লুট হয়েইছে, সাগরবান্ধি গ্রামের ধাতু হেমব্রমের মেয়ের বিয়ের জন্য রাখা বারো হাজার টাকাও লুট হয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে আদিবাসীরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। চল্লিশোর্ধ মতিলাল মাডি পালাতে পারেনি, তাকে পাথর দিয়ে থেঁতলে মারা হয়। গুরুতর আহত হয় তার ভাই মঙ্গল মাডি ও কবিরাজ মুর্মু। এ সবই ঘটে আইনরক্ষক পুলিশের সতর্ক দৃষ্টির সামনে। কারণ, দাঙ্গাকারীরা প্রত্যেকেই শুধু যে সিপিএমের পার্টি তহবিলে লম্বা টাকা জমা করে তাই নয়, তারা পবিত্র ভোটার। আর পুলিশ তো নিখাগী কোনও কালেই নয়! মহম্মদবাজার ব্লকের তিন হাজার আদিবাসীকে জীবন রক্ষার জন্য গ্রাম ছেড়ে পালাতে হলো। অনেক আদিবাসীর এখনও খোঁজ নেই। সৃষ্টি হয়েছে আদিবাসীদের অস্তিত্বের সংকট। সেই অস্তিত্বের সংকট থেকে মুক্তির জন্য বাঁশের লগির উপর আমডাল চড়িয়ে একত্রিত হলো আদিবাসীরা। তারা তো আমাশয়গ্রস্ত চাটুর্য্যে-মুখুর্য্যে-ঘোষ-বোস-মিত্তির নয় যে সুশীল সমাজ গড়ে টিভির সামনে আসবে। বা, গাঁধীবাদীও নয় যে একজনের মাথায় পাথর মারলে আর একজন এসে মাথা পেতে দেবে। তারা তাদের চিরন্তন অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো খাদান আর ক্রাশারগুলির উপর। সেগুলি ভাঙ্গা পড়লো। বীরপুরুষরা লুঙ্গি তুলে পালালো। বীরভূম আদিবাসী গাঁওতার সুনীল সোরেন ও রবীন সোরেনের মতে দুজন মুসলিম গুণ্ডা কালু শেখ ও আনারুল শেখ বোমা বাঁধতে গিয়ে মারা পড়ে। এখনও পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ। আদিবাসী গ্রামগুলিতে এখন ত্রিপল আর লঙ্গরখানা। আদিবাসী যুবকেরা তীর-ধনুক নিয়ে গ্রাম পাহারা দিচ্ছে। খাদান-ক্রাশার বন্ধ। এখন শুধু আর মুহম্মদ বাজারেই নয় সারা বীরভূমে ছড়িয়ে পড়ছে আন্দোলন। বীরভূম আদিবাসী

> **অস্তিত্বের সংকট থেকে মুক্তির জন্য বাঁশের লগির উপর আমডাল চড়িয়ে একত্রিত হলো আদিবাসীরা। তারা তো আমাশয়গ্রস্ত চাটুর্য্যে-মুখুর্য্যে-ঘোষ-বোস-মিত্তির নয় যে সুশীল সমাজ গড়ে টিভির সামনে আসবে। বা, গাঁধীবাদীও নয় যে একজনের মাথায় পাথর মারলে আর একজন এসে মাথা পেতে দেবে। তারা তাদের চিরন্তন অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো খাদান আর ক্রাশারগুলির উপর।**

(এরপর ৪ পাতায়)

দায়ে পড়ে কেরলে হিন্দু তাস খেলছে সি পি এম

(২ পাতার পর)

সিপিএমের সঙ্গে জামাত নেতাদের আসন সমঝোতা হয়েছিল। ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মুসলিম লীগের প্রাক্তন সদস্য ও সিমি-র নেতা কে টি জালিল কুট্টিপুরম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে গতবার জয়ী হয়েছিলেন স্রেফ সিপিএমের সমর্থনের জন্য। এমনকী, ওই আসনে পি কে কুন্নহালিকুট্টির মতো মুসলিম মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিজয়নের মাখামাখি কোনও নতুন ঘটনা নয়। গত লোকসভা নির্বাচনের এদের সাথে জোটও হয়।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সাথে কেরলেও গত লোকসভা নির্বাচনে খুব বাজে ফল করে সিপিএম। কুড়িটার মধ্যে মাত্র দু'টো আসন জেতে তারা। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাদের নেতৃত্বের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। মুসলিম মহল্লাগুলোতে যেটুকু ভোট পাবার পেয়েছে তারা, কিন্তু হিন্দু-এলাকায় তাদের ভাঁড়ার একেবারে শূন্য। এমনকী মধ্য কেরলের মতো একটা খৃস্টান অধ্যুষিত এলাকা, যার কিছু অংশে সিপিএমের বেশ ভাল ভোটব্যাঙ্ক ছিল, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারাও। সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে সিপিএমের কেরল নেতৃত্ব তাদের নোটে উল্লেখ করে জেহাদী মুসলিমদের বিরুদ্ধে জনগণের ধূমায়িত রোষের কথা (যার অন্যতম একটা কারণ হতে পারে 'লাভ জেহাদ'-এর নামে হিন্দু রমণীদের মুসলমান যুবকদের প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে বিবাহ এবং সেই হিন্দু রমণীদের ভারত-বিরোধী জেহাদে কাজে লাগানো। এর ফলে শুধুই হিন্দুই নয়, খৃস্টান অভিভাবকরাও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন)। এই নোটের পরে পার্টি লাইন পাল্টানো হয়। এরপরেই দেখা যায় ত্রিবাঙ্কুর দেওয়াসম পরিচালন পর্ষদের মতো একটি নামী সংস্থার চেয়ারম্যান করা হয় এক হিন্দুকে। যিনি চেয়ারম্যান তিনি শুধু হিন্দুই নন, তাঁর পদবী হলো নাইয়ার। চেয়ারম্যান নির্বাচনের কয়েকদিন আগেই রাজ্যস্তরের কয়েকজন সিপিএম নেতা 'নাইয়ার সার্ভিস সোসাইটি'র চাঙ্গানেশ্বরীর প্রধান কার্যালয়ে যান এবং ওই সম্প্রদায়কে এতদিন 'রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে অবহেলা' করবার জন্য ক্ষমা চেয়ে আসেন। ঠেলায় পড়লে সিপিএমও যে হিন্দু তাস খেলতে পারে সেটাই দেখিয়ে দিল কেরলবাসী হিন্দুরা। আরও স্পষ্ট করে বললে, কেরলে এককাট্টা হওয়া নাইয়ার পদবী-ধারীরা।

বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, পার্টিতে কারাট-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কেরলে সিপিএমের রাজ্য-সম্পাদক পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বে পার্টি লাইন বদলে ফেলা হয়। আর মুসলিম তোষণ তো নয়ই বরং হিন্দুদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সেই ভোটব্যাঙ্গ পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর একটা নমুনা যদি নাইয়ারদেরটা হয়, তবে অপরটা অবশ্যই এস এন ডি পি যোগার সাধারণ সম্পাদক ভেল্লাপাল্লি নাতিসেনের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করে তাঁর এজাভা সম্প্রদায়ের ভোটকে হস্তগত করার প্রয়াস।

কেরলের সিপিএম এখন হিন্দুদের কাছে 'ক্ষমা' চাইছে স্রেফ ভোটের তাগিদে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভবিষ্যতে এমনও দিন আসতে পারে, যেদিন কেরল সিপিএম তাদের মুসলিম তোষণের 'ঐতিহাসিক ভুল' প্রকাশ্যে স্বীকার করে নেবে।

প্রশ্ন একটাই—বাংলার সিপিএম কি তা পারবে? এর উত্তরও বোধহয় একটাই — বাঙালার হিন্দুরা কেরলের মতো এককাট্টা হলেই সেটা সম্ভব। নচেৎ নয়।

গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী

(১ পাতার পর)

করবে। উদ্দেশ্য, প্রমাণ করা যে তারা পার্টির অনুগত নয়। গত ৩৩-৩৪ বছর ধরে পুলিশ-প্রশাসনের সক্রিয় সাহায্যে যে পার্টি সংগঠন এই রাজ্যে গড়ে উঠেছে তা এবার তাসের ঘরের মতো ধসে পড়তে বাধ্য। প্রমাণ হয়ে যাবে পার্টির সংগঠনের গণভিত্তি কমজোরি। পুলিশ-প্রশাসনকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক সংগঠন করা যায় না। সিদ্ধার্থবাবুরা এই কারণেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। বিমানবাবু-বুদ্ধ বাবুরাও ব্যর্থ হবেন। তাঁরা যদি সত্যিই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হন এবং পার্টিকে রক্ষা করতে চান তবে সরকারি সুযোগ-সুবিধার মোহ ত্যাগ করে বিধানসভার নির্বাচন কিছুটা অন্তত এগিয়ে নিয়ে আসুন। তাতে আখেরে তাঁদের লাভই হবে।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না।

—সঃ স্বঃ

আদিবাসীদের চোখের জল

(৩ পাতার পর)

গাঁওতা, আদিবাসী রক্ষা মঞ্চ , মাঝি পরগণা দইচী, আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। কারণ, চক্রান্তটা আদিবাসী উৎখাতের। সীমান্তবর্তী জেলা না হওয়া সত্ত্বেও বীরভূমের সংখ্যালঘু জনসংখ্যা ২০০১ সালের জনগনা অনুযায়ী ২৯.০৩ শতাংশ; নলহাটি ও মুরারই ব্লকে সংখ্যালঘুরাই সংখ্যাগুরু। মাহাশ্বেতা তাঁর নিজস্ব ঢঙে 'জনশ্রুতি' বলে সমস্ত ঘটনাটা সিপিএম-তৃণমুলের রাজনীতির চোরাবালির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছেন দৈনিক স্টেটসম্যানে প্রকাশিত নিবন্ধের শেষের দিকে—যা মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। উনি 'কমল খান'দের 'বেল আউট' করতে চাইছেন। ব্যাপারটা ২১ এপ্রিল থেকেই গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব—শেমীয় বনাম অশেমীয় গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই। অ-আদিবাসী অমুসলমানরা আদিবাসীদের পক্ষে। তারা যে সবাই তৃণমূল, এমন ব্যাপার নয়। আমাদের এই বক্তব্য সরেজমিনে তদন্ত করার ফল। এখন দেখার বিষয়, আদিবাসীদের চোখের জল বুদ্ধ দেব প্রশাসনের কানে কবে ঢুকবে। আশু প্রয়োজন সেখানে আইনের শাসন প্রবর্তন করা—২১ এপ্রিল যারা মিছিলের ডাক দিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা সৃষ্টির দায়ে কঠোর ধারায় মামলা জারি করা। এর জন্য প্রয়োজন সি আই ডি তদন্ত। পবিত্র ভোটারদের বিরুদ্ধে এ ধরণের পদক্ষেপ কি গ্রহণ করতে পারবে প্রশাসন?

সীমান্তেবাংলাদেশী-জেএমবি গোষ্ঠী

(১ পাতার পর)

নেতা সাইদুর রহমান, হুজি নেতা মুফতি হান্নান ও হিযবুত নেতা ড. মহিউদ্দিনের মধ্যে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে এই মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মওলানা সাইদুর রহমান গ্রেপ্তার হওয়ার আগে তার সঙ্গে কারাগার থেকেই যোগাযোগ করেছিলেন মুফতি হান্নান ও ড. মহিউদ্দিন। তিন সংগঠনের এক সঙ্গে কাজ করা ও সশস্ত্র ইসলামি বিপ্লবের ব্যাপারে কথা হয় ওই যোগাযোগে এবং মতৈক্যও হয়। সিদ্ধান্ত হয়, তিন জঙ্গি সংগঠন সারাদেশে সাংগঠনিক কাজকর্ম জোরদার করে চূড়ান্ত পর্যায়ে সশস্ত্র ইসলামি বিপ্লবে নামবে। বাংলাদেশ ও ভারতে অত্যন্ত কৌশলে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিন সংগঠনের নেতাদের কাছে 'এই বার্তা' দ্রুত পৌঁছে যায়। গত সপ্তাহে মওলানা সাইদুর রহমান গ্রেপ্তার হওয়ার পর রিমান্ডে নেওয়ার আগে কারাগারেও তিনজনের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে। কারারক্ষীরা তা বুঝতেই পারেননি। পুলিশ এই তথ্যও পেয়েছে মওলানা সাইদুরের কাছ থেকে। জঙ্গি নেতাদের এখন পৃথকভাবে আরও কড়াকড়ির মধ্যে রাখা হয়েছে।

মুসলিম সংরক্ষণেই ধরাশায়ী সিপিএম

(১ পাতার পর)

নির্বাচনেও বামফ্রন্ট ধরাশায়ী হবে। তিনি অবিলম্বে সংরক্ষণ প্রত্যাহারের দাবী জানান। সন্ত্রাসবাদী ও মাওবাদীদের হিংসাত্মক কাজকর্ম নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অস্ত্রের মাধ্যমে কোনও সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়। মাওবাদী সমস্যা সমাধানে তিনি পিছিয়ে পড়া এলাকায় উন্নয়নের গতি বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০ টাকা (সডাক)

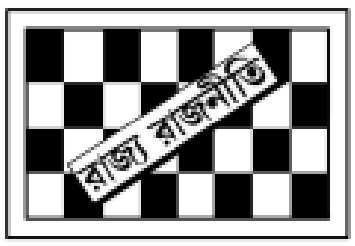

সি পি এমের অন্তিমযাত্রা শুরু

নিশাকর সোম

পৌর-নির্বাচন শেষ হয়েছে। এই কলামে লেখা হয়েছিল সি পি এম গৌরবজনক পরাজয়ের জন্য চেষ্টা করছে—কিন্তু না, এমনটা ঠিক হয়নি! বস্তুত সিপিএম ল্যাজে-গোবরে হয়ে পরাস্ত হয়েছে। এই কলামে লেখা হয়েছিল যে ফরওয়ার্ড ব্লকের ডাঃ সুবোধ দে কলকাতার পৌর-নির্বাচনে পরাজিত হবেন। তিনি কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছেন। লেখা হয়েছিল বিজেপি একাধিক কেন্দ্রে জয়ী হবে। বিজেপি-র তিনটি কাউন্সিলার ছিল—ফের তিনটি কাউন্সিলারই হয়েছেন। আর দু'-একটি উল্লেখযোগ্য পরাজয় হলো—তৃণমূলের জাভেদ খান এবং রিজওয়ানুর পরিবারের রুকবানুর রহমান। রিজওয়ানুর মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সামগ্রিক পৌর-নির্বাচনের ফলাফল যা দেখা যাচ্ছে তা হলো—তৃণমূল—২৪টি, বামফ্রন্ট—১৮টি, কংগ্রেস ৭টি পুরবোর্ড গঠন করবে। ত্রিশঙ্কু হয়েছে ৩১টি পুরসভায়।

তৃণমূল ৫টি পুরসভা থেকে প্রায় ৪০টি-তে বোর্ড গঠন করার পথে। কংগ্রেস-এর ৭টি বোর্ড ছিল—৭টি আছে। বামফ্রন্ট-এর ৫৪টি থেকে ১৮টিতে নেমে গেছে।

কলকাতার পুরসভার অবস্থাটা দেখা যাক—তৃণমূল ছিল—৪২, হয়েছে—৯৫, বামফ্রন্ট ছিল—৭৫, হয়েছে—৩৩, বিজেপি ছিল—৩, হয়েছে—৩। কলকাতাতে সিপিএম শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয়েছে এর কারণ প্রথমত, পুর পরিষেবা ছিল না—পার্টটাইম মেয়র ব্যর্থ—ব্যর্থ মেয়রের মনিটর প্রশান্ত চ্যাটার্জি। প্রশান্ত চ্যাটার্জি-এর আমলেই কলকাতা পুরসভাতে সিপিএমের ক্ষয় শুরু হয়। দ্বিতীয়ত, সিপিএম-এর প্রচারটায় শুধু তৃণমূল-মাওবাদী আঁতাত আর তৃণমূলের নৈরাজ্য—সন্ত্রাসের কথা ছিল। তারা কোনও পরিষেবার সাফল্য তো তুলে ধরেইনি উপরন্তু, সংবাদপত্রে মেয়রের সমালোচনা করতে গিয়ে কলকাতা জেলা পার্টি বিদায়ী পুরসভা ব্যর্থ এটাই বলেছিল! ফলে পার্টির নিচের তলার কর্মীরা বুঝে গিয়েছিলেন হার নির্ঘাত। তাই তাঁরা আর গা-লাগিয়ে কাজ করেননি। বিশেষ করে যাঁরা 'পাওয়ার জন্য' কাজ করতেন—তাঁরা পাওয়ার সম্ভাবনায় সম্ভাব্য জয়ীদের দিকেই গেছেন। আর একদল গরীব দুস্থকর্মী দেখেছেন তাঁদের চাক্‌রি দেওয়ার বেলায় নেতারা 'অসম্ভব' বলেছেন, আর নিজের স্বজনপোষণ এবং নিজের সাইকো-ফ্যানদের চাকরি ও আয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ-ছাড়া নিচের তলার কমরেডরা দেখেছেন নেতারা গাড়ি-বাড়ি-সম্পদশালী হয়ে উঠেছেন আর তাঁরা বাঁচার জন্য চাক্‌রি ভিক্ষা প্রার্থনা করে পেয়েছেন শুধু 'না'। এই বঞ্চি তরাই কিন্তু শেষদিকে ঝাঁপিয়ে ছিল পার্টিকে বাঁচানোর জন্য—এদের কথা পার্টি মনেও করবে কি?

এছাড়া বিমান বসু নামক মূর্খ-বাচাল-নোংরা কথায় অভ্যস্ত এক ব্যক্তি কলকাতায় জনমানসে কু-প্রভাব ফেলেছে।

কলকাতায় খালি মুসলিম তোষামোদ করতে গিয়ে হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। কলকাতায় প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে—নেতার মরজি মাফিক প্রার্থী ঠিক করে পার্টির নীচু তলাকে মনক্ষুণ্ণ করেছেন সিপিএম নেতৃত্ব।

সর্বোপরি উত্তর কলকাতা সিপিএম তথা বামফ্রন্টের জয়ের নিশান দুটি—১০নং ওয়ার্ডে করুণা সেন এবং ২০নং ওয়ার্ডে সুধাংশু শীল। বাকি উত্তর কলকাতাতে সিপিএম সাফ—এখানকার নেতারা হলেন রাজদেও গোয়ালা, অসিত নন্দী, শ্যামল নন্দী প্রমুখরা। এঁদের অপসারণ চাইছেন নিচের তলার কর্মীরা। মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা অঞ্চলের তথা বিদায়ী মেয়রের ওয়ার্ড ১০০নং-এ সিপিএম পরাজিত এবং তৃণমূলের এক অ-রাজনৈতিক ব্যক্তি জয়ী। তিনি অ্যান্ডু উইলের কর্তাব্যক্তি ছিলেন এবং বিরোধী নেতা পার্থ চ্যাটার্জির বন্ধু। আদতে বুদ্ধ বাবুর জন্যই এই দুরবস্থা। কলকাতাতে গার্ডেনরিচ বেহালা থেকে সিপিএম ধুয়ে-মুছে গেছে—দিলীপ সেন এখনও নেতা থাকবেন?

নিরঞ্জন চ্যাটার্জিকেও বহাল রাখতে হবে! কলকাতা জেলার সম্পাদকমণ্ডলীর পরিবর্তন কি হবে না?

> "কলকাতায় খালি মুসলিম তোষামোদ করতে গিয়ে হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। কলকাতায় প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে—নেতার মরজি মাফিক প্রার্থী ঠিক করে পার্টির নীচু তলাকে মনক্ষুণ্ণ করেছেন সিপিএম নেতৃত্ব।"

বিধাননগর বিধানসভায় সিপিএম ১৮ থেকে নেমে ঠিক অর্ধেক হয়েছে—৯। আর তৃণমূল ৫ থেকে বেড়ে ১৬ হয়েছে। বিধাননগরে মেয়র বিশ্বজীবনবাবুর মধ্যে নাটকের প্রভাব পড়েছে। এছাড়া যেসব ব্লকে সিপিএম-এর কাউন্সিলাররা থাকেন—সেখানে ব্লকের লোকেরা তাঁদেরকেই ভোট দেননি। এছাড়া দিলীপ গুপ্তর আমল থেকেই দুর্নীতি চলেছিল। দিলীপ গুপ্তর পাথরের বাড়ি, ওষুধের দোকান। শোনা যায় মিনিবাস এবং সমস্ত ভাইকে সল্ট লেকে জমি দেওয়া ইত্যাদি কাজে তিনি সু-পটু ছিলেন। যেমন দুর্নীতির কথা হোত, সুভাষ চক্রবর্তীকে নিয়ে—উপঢৌকন হিসাবে তাঁর বাড়ি পাওয়া। লোকে বলে থাকেন তাঁর বাড়ির কুকুরটি ছাড়া সবাই নাকি সম্পদশালী।

উত্তর ২৪ পরগণায় বরানগরে ৪৮ বছর পরে সেখানকার মানুষ সিপিএমকে দূর করে দিল পৌরসভা থেকে। এটি আইনমন্ত্রী রবি মৈত্রর এলাকা। কামারহাটিতে সিপিএম-১৮ তৃণমূল-১৭।

উল্লেখ্য, সিপিএম-এর জয় বনগাঁ এবং গয়েশপুরে। অমিতাভ নন্দী, তড়িৎ তোপদার, পরিবহণ মন্ত্রী রণজিৎ কুণ্ডু এবং বড়দা অমিতাভ বসু এবার রণজিৎ মুখার্জিদের হাতে রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিন—এই আওয়াজ উত্তর পরগণার সিপিএম কর্মীদের মধ্যে উঠেছে। বারাসাতে পুরসভা হাতছাড়া হয়েছে কেন? হুগলিতে সিপিএম নিকেশ। যেখানে অনিল বসুর মতো নেতারা নেতৃত্ব দেন তখন পার্টির বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ তীব্র তো হবেই!

কংগ্রেস-এর অবস্থাও শোচনীয়—রাণাঘাটে প্রণববাবুর তীব্র ঝাঁঝালো বক্তৃতা সত্ত্বেও ১২ জন কংগ্রেস কাউন্সিলার তৃণমূলে যান এবং পুরসভাটি তৃণমূল দখল করেছে। প্রণববাবু এর দায়ও স্বীকার করে নিয়েছেন। পৌর নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনে কেন্দ্রে মমতা তার চাপ বাড়াবেন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করতে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সদা ব্যস্ত হবেনই। আর রাজ্যে তৃণমূল রাজ্য কংগ্রেস-কে কম্যাণ্ড করবে আর তা কংগ্রেসকে মেনে নিতে হবে। কারণ প্রদীপ ঘোষদের পরাজয়—তৃণমূলকে কম্যাণ্ডিং অবস্থায় নিয়ে এসেছে।

পৌর নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে বিমান বসু সহ কিছু সিপিএম-নেতা বোঝাতে চাইছেন যে বিগত লোকসভার নির্বাচন থেকে ভাল ফল হয়েছে। কারণ কিনা ১১৯টি ওয়ার্ডে তৃণমূল এগিয়ে ছিল—সেখানে মাত্র ৯৫টি পেয়েছে। এই আহাম্মুখেরা জানেন না কংগ্রেস-তৃণমূল এক হলে সিপিএম একটা সিটেও জিততে পারতো না।

রাজ্য সিপিএমের অন্যতম নেতা তথা মন্ত্রী পলিটব্যুরো সদস্য নিরুপম সেন বলেছেন—'একি ভাঙা বাড়ি জোড়া বা মেরামত—এটা মনের ক্ষত। তা দূর করতে দেরী হবে। আমরা তো অনেকদিন থাকলাম, অন্যরা আসুক না। আমরা কি চিরদিন থাকবো!'

আর এস পি নেতা ক্ষিতি গোস্বামী বলেছেন, 'বুদ্ধ বাবু তিলক কেটে হাতজোড় করে বৈষ্ণবীয় কায়দায় বললেও চিঁড়ে ভিজবে না।' এর অর্থ হলো বুদ্ধ বাবু হঠাও। বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম-বিনয়-শ্যামল—এই নেতাদের বিরুদ্ধে সিপিএম-এর কর্মীরা তীব্র সমালোচনা করছেন। পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতেও সমালোচনা হচ্ছে। বুদ্ধ বাবুর 'প্রণবদা' দায় স্বীকার করেছেন। বুদ্ধ বাবু কি তাঁর প্রণবদা'র পথে যাবেন?

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

স্বস্তিকার দাম

প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য

সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

অন্য রকম

সুধা মূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ নাম তাঁর সুধা মূর্তি। বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই। ভারতীয় নারীদের আবহমানকাল থেকে চলে আসা শাড়ীতেই তিনি স্বচ্ছন্দ। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতীর ডুয়েট কম্বিনেশন। গুণের মধ্যে তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার, গোটা ত্রিশেক বইয়ের লেখিকা। সর্বোপরি একজন শিক্ষিকাও বটে। সত্যি কথা বলতে কী, এনার শখ ছিল হিন্দি ছায়াছবি দেখা। সেই শখ থেকেই গোটা কয়েক হিন্দি ছবিতে অভিনয়ও করে ফেলেছেন। সব থেকে বড় কথা তিনি একজন মা। হাজার কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সন্তানদের আলাদা করে সময় দিয়েছেন। এনার স্বামীর নাম নারায়ণ মূর্তি। পরিচয় অনাবশ্যক। তবু তথ্যের খাতিরে বলতে হচ্ছে বিখ্যাত শিল্প-সংস্থা ইনফোসিসের চেয়ারম্যান হলেন গিয়ে নারায়ণ মূর্তি। বেজায় অবাক হয়ে গেলেন বুঝি? ভাবছেন লক্ষ্মী আর সরস্বতীর টাগ অব্ ওয়ারের কথাই এতকাল শুনে এসেছেন। এমন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান-এর কথা কস্মিনকালে শোনেননি। আসলে ব্যাপারটা হলো কি, এটা ঠিক দুর্গাপুজোর প্রতিমা দর্শনের মতো। মা দুর্গা মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, পাশে বাধ্য দুই মেয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকা মা লক্ষ্মী ও মা সরস্বতী। এখানে মা দুর্গার ভূমিকায় অনায়াসেই কল্পনা করতে পারেন সুধাদেবীকে। যার প্রবল-প্রতাপান্বিত ব্যক্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করে ধরা দিয়েছেন লক্ষ্মী-সরস্বতী। তাঁর এই লক্ষ্মীর গরিমা স্রেফ স্বামী নারায়ণমূর্তির কল্যাণে— এমনটা ভাবলে মস্ত বড় ভুল করবেন। কারণ ইনফোসিস যখন তৈরি হচ্ছিল— ইনি ছিলেন তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। নারায়ণমূর্তিও বহুবার তাঁর জীবনে সাফল্যের পেছনে স্ত্রী-র অবদানের কথা শুধু স্বীকার করেই নেননি বরং ইনফোসিস নামক

সুধা

বিশাল শিল্প সাম্রাজ্য গড়ে তোলার পেছনে 'উদ্যোগ-পতি' স্ত্রী-র কথা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। সুধামূর্তির বক্তব্য—"আমি ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস নিয়ে চর্চা করতে ব্যক্তিগতভাবে খুবই পছন্দ করি। এর পাশাপাশি পারসিক, আরবিক, মারাঠি এবং অন্যান্য ভাষার লিপি নিয়েও কাজ করার ইচ্ছে।" তবে তাঁর প্যাশন অবশ্যই হিন্দুস্তানী সঙ্গীত। জানাচ্ছেন, যখন ছোট ছিলেন তখন রেডিও-ই ছিল তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। মজা করে বলছেন, এত হিন্দী ছবি তিনি দেখেছেন এবং সেইসাথে তার মনোজ্ঞ বিশ্লেষণও করেছেন যাতে করে তাঁর পি এইচ ডি (ডক্টরেট) পাওয়া উচিত। তিনি প্রথম হিন্দী ছবি দেখেছিলেন ১৯৫৮-তে রিলিজ করা মধুমতী। সঙ্গে মজার তথ্য জুড়ছেন—যখন তিনি পুণেতে ছিলেন, তখন নাকি ৩৬৫ দিনে ৩৬৫টি ছায়াছবি দেখেছিলেন! ইনফোসিসের মতো বিশাল শিল্প সাম্রাজ্যের মালকিন হয়েও তিনি মনে রাখার মতো একটা 'অন্যরকম' কথা শিখিয়েছেন ভবিষ্যত ইনফোসিসের মালিক নিজের সন্তানকে। কথাটা এরকম—"ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু রাজত্বের উত্থান-পতন হয়েছে। কোনও সাম্রাজ্যই দুশো-আড়াইশো-র বেশি স্থায়ী হয়নি। ইতিহাসের কালস্রোতে ইনফোসিস এই ঢেউ-এর প্রতিকূলে যাবে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। তাই অর্থের প্রাচুর্য্যে যেন অহংকার না আসে। মানবসেবায় তা ব্যয় করো।"

এরপর ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কি ঘটবে?

এম ভি কামাথ।। পার্ক শীর্ষ বৈঠকে যা-ই ঘটুক না কেন আমরা কি আশা করতে পারি যে, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান চিরকালের জন্য মিটে যাবে? দুটো জিনিস কিন্তু ইসলামাবাদ ও দিল্লির কাছে খুব স্পষ্ট—প্রথমত, কাশ্মীর সমস্যা যত শীঘ্র সম্ভব সমাধান করে ফেলা উচিত, কারণ গত ষাট বছরে পাকিস্তান বুঝতে পেরেছে যে, গায়ের জোরে কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না, দ্বিতীয়ত, যদি সমাধানসূত্র খুঁজতে দেরি হয়ে যায় তো ভবিষ্যৎ আলোচনা কেবল আলোচনা স্তরেই থাকবে, সমাধান অধরাই থেকে যাবে, বাড়বে মানুষের দুর্দশা। শঙ্কার বিষয় হলো আগামী দিনে যদি ইসলামী মৌলবাদীরা ক্ষমতা দখল করে নেয় তবে শেষের সে দিনগুলি কী বিষম ভয়ঙ্কর হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

তবে ঘন কালো মেঘের কিনারায় রূপালী রেখাও দেখা যাচ্ছে। ২০০২ থেকে ২০০৭ অবধি মুশারফ জমানায় বিদেশমন্ত্রী খুরশিদ মহম্মদ খানসুরিকে যদি বিশ্বাস করা যায় তবে বলতে হয় যে, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে আধিকারিক পর্যায়ে যেসব গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা হয়েছে তাতে উঠে আসছে একটা কথা এবং তা হলো দুই দেশই তাদের অঙ্গীভূত কাশ্মীর থেকে আংশিক সেনা প্রত্যাহার করবে এবং স্বায়ত্ত্বশাসন যা উগ্রপন্থীরা চেয়ে আসছে তা কার্যকর করা হবে। খানসুরি বলে আসছেন যে "আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্ত্ব শাসনের মধ্যবর্তী স্থানে একটা সমঝোতায় পৌঁছাতে চাইছি"। মনে হচ্ছে, বিষয়টার স্পর্শকাতরতা উপলব্ধি করতে হবে এবং বুঝতে হবে এতে কেউই জিতে যায়নি।

২০০২ থেকে ২০০৭ অবধি মুশারফ জমানায় বিদেশমন্ত্রী খুরশিদ মহম্মদ খানসুরিকে যদি বিশ্বাস করা যায় তবে বলতে হয় যে, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে আধিকারিক পর্যায়ে যেসব গভীর কথাবার্তা হয়েছে তাতে উঠে আসছে একটা কথা এবং তা হলে দুই দেশই তাদের অঙ্গীভূত কাশ্মীর থেকে আংশিক সেনা প্রত্যাহার করবে এবং স্বায়ত্ত্বশাসন যা উগ্রপন্থীরা চেয়ে আসছে তা কার্যকর করা হবে।

কিন্তু এইসব আলোচনা হয়েছিল সামরিক সরকারের অর্থাৎ মুশারফের আমলে। কিন্তু সমস্যার সমাধানে আজ তা ব্যবহৃত হচ্ছে না কেন?

এ জন্য যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল তা হলো, ওই সময়ে মুশারফ প্রশাসন অচল হয়ে পড়েছিল পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতিকে পদচ্যুত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেদেশের নাগরিকদের আন্দোলনে। এর মধ্যেই আরও সংবাদ ফাঁস হয়ে যাচ্ছিল। দুই "বিশেষ দূতের" মধ্যে শত শত ঘণ্টার আলোচনা জানাজানি হয়ে গেল। এই দুই দূত হলেন ভারতের পক্ষে সতীন্দ্র লাম্বা ও পাকিস্তানের পক্ষে তারিক আজিজ্। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, আমরা জানতে পারলাম ওই চুক্তি অনুমোদিত হয়েছিল ভারতের পক্ষে নিরাপত্তা বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি-তে এবং পাকিস্তানের তরফে সে দেশের কর্পস কম্যাণ্ডার কনফারেন্সের মধ্যে। বস্তুত এরপর অনেক কিছু ঘটে গেছে এবং আলোচনায় অবস্থান ফের আগের জায়গায় ফিরে গেছে ও নতুন জল বন্টন ইস্যু খাড়া করা হয়েছে।

কিন্তু এতে কোনও সমস্যা তৈরি হয়নি। ভারতের সিন্ধুনদ জল আয়োগের অধিকর্তা জি. রঙ্গনাথনের সিন্ধু নদ জল চুক্তি (১৯৬০) পুরোপুরি কার্যকর এবং সম্প্রতি ১০ ফ্রেব্রুয়ারি পাঁচদিনের কর্মসূচীতে পাকিস্তানে গিয়ে পুরোদস্তুর জলবন্টন বিষয়টা দেখভাল করে এসেছেন। ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটেছে। সমস্যার বিষয় হলো পাকিস্তান কাসভকে ফেরৎ চাইছে এবং কোনও ভারতীয় সরকার তা মানবে না। উপরন্তু কি এটা দাঁড়াচ্ছে না যে ২০০৭ সালে যে সমঝোতা হয়েছিল তা কিছু বর্জ্য কাগজ ছাড়া আর কিছু নয়? তা হলে কি আবার নতুন করও তৈরি সমস্যার সমাধানে কেঁচেগন্ডুষ করতে হবে। দুই দেশ যখন চুক্তি নিয়ে বেশ স্বস্তিতে তখনই কাশ্মীরের উগ্রপন্থী সঈদ শাহ্ গিলানী বিপরীত সুরে কথা বলতে লাগল। গিলানী চায় কাশ্মীর পাকিস্তানে মিলে যাক্। দৃশ্যত মুশারফের আলোচনায় সে খুশি নয়। আফগান নীতি নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল ২০০৭-এ তা কার্যত পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে ভারত সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে এবং ভারতের প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠে। পাকবাহিনীতে এক অংশ এমন রয়েছে যারা চায় না ভারতের সঙ্গে সে দেশ এক সহবস্থানের সমঝোতায় আসুক। তাহলে কি জেনারেল কিয়ানি সেই গোষ্ঠীর যারা মুশারফের বিরোধী। মনে রাখতে হবে আশির দশকের মধ্যভাগে তৎকালীন শাসক জেনারেল জিয়া-উল-হক পাকিস্তানকে ইসলামীকরণ করতে সেনাবিভাগে প্রচুর মৌলবাদীদের অল্পকালের মধ্যে বিগ্রেডিয়ার পদে উন্নীত করেই নীতি-নির্ধারণের দায় তাদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাহলে কি এরা কখনওই সমঝোতা চাইবে? জিয়ার সামরিক একনায়কতন্ত্রেই সামরিক বাহিনী পুরোদস্তুর ইসলামীকরণ হয়ে যায়,—এ রকমই এক বিশেষজ্ঞের অভিমত। এটা আমাদের কাছে নেহাত-ই আত্মঘাতী হবে অবস্থা আরও বিষময় হয়েছে যখন দেখা যাচ্ছে যে, লস্কর-এ-তৈবা-র প্রধান হাফিজ সঈদ-কে পাকিস্তান সে দেশে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ চালাতে খুল্লাম-খুল্লা অনুমতি দিচ্ছে। সম্প্রতি ভারতীয় সীমানা বরাবর সামরিক গতিবিধি বাড়িয়ে দিয়ে এই বার্তা পাকিস্তান পাঠাচ্ছে যে, সামরিক কর্তাদের অ্যাজেণ্ডায় অন্যরকম কিছু রয়েছে। তাহলে যদি বাহিনীর ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশাসন থেকে আলাদা করে দেখি। লাহোর আদালতে লস্করের যে দুই শীর্ষ নেতা জাকিয়ুর রহমান লাক্‌ভি এবং আবু-আল-গোন, লালকেল্লা ও অক্ষরধামের মূল অভিযুক্তের যে বিচারের নামে প্রহসন চলছে তার দ্বারা কোন্ জিনিসটা সূচিত হয়?

আমরা এমন লোকজনদের সম্পর্কে আলোচনা করব যাদের লক্ষ হলো কেবল মৌলবাদ এবং মৌলবাদ তাদের দুই নিরপরাধ শিখের মুণ্ডচ্ছেদ করতে দ্বিধান্বিত করে না। এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বটে, কিন্তু তা বাতিল হয়ে যায়। স্যার ক্রীক (নিয়ন্ত্রণরেখা) নিয়েও কি সমাধানসূত্র পাওয়া যায় নি? সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ সেই সমঝোতাকে শেষ করে দিয়েছে। ২০০৯-এর কোনও এক সময়ে 'হিন্দু' পত্রিকায় ইসলামাবাদে কয়েদ-ই-আজম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পারভেজ হুওগর কিছু উদারপন্থীদের স্বপক্ষে ওকালতি করে বলেছেন যে, "ভারতের উচিত নিয়ন্ত্রণরেখা তুলে দিয়ে দু'পক্ষের সহমতের ভিত্তিতে কিছু অংশে সৈন্য সরিয়ে দু'দেশের জনগণের যাতায়াতের পথ সুগম করে তোলা।" এই অধ্যাপকটি এই নিবন্ধটি পাকিস্তানের পত্রিকা 'ডন'-এ ও পাঠিয়েছেন। তাঁর মতে পাকিস্তানের সঙ্গে আপোস কেবল শুভেচ্ছা বা মৈত্রীর জন্য নয়, বরং এটাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত দু'দেশের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে। আমাদের জন্য পাকিস্তানের পক্ষে এটা আরও বেশী তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সাধারণ ব্যাপার হলো দু'দেশকেই আরও বেশী বাস্তব হতে হবে। এক দেশ ভাবছে যে, আলোচনা চলছে আমাদের পশ্চাতে। হুরিয়ৎ চেয়ারম্যান মিরওয়াজ ওমর ফারুক সাংবাদিকদের বলেছেন, "অনেক কিছুই ঘটছে। আলোচনা চলছে...অনেক সম্ভাব্য সমাধানের পথ খুঁজতে... নতুন দিল্লি-শ্রীনগর চুক্তি নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই ফলপ্রসূ অগ্রগতি হচ্ছে।"

আমাদের আশা মিডিয়াকে না জানিয়ে নিঃশব্দে অনেক ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু ঘটছে। আমরা হয়ত অভাবনীয় কিছু ঘটতে দেখব না তবুও সরকারি মুখপাত্রদের বক্তব্যকেও মেনে নেওয়া যায় না পুরোপুরি সত্য বলে।

পাক-ভারত দ্বন্দ্বে দু'দেশের আলোচনায় অনেক কিছু ঘটনা ঘটছে যা আমাদের জানানো হচ্ছে না।

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ১৫.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন।

—ব্যবস্থাপক

রাজনৈতিক নেতাদের 'হারাকিরি'র ফল ভোগ করছে ঝাড়খণ্ডবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অনেক বছর আগেকার কথা। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা জনজাতিদের প্রতি অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে তখন সরব হয়েছেন শিবু সোরেন। শিবুর অদম্য প্রতিবাদ স্পৃহা আর আন্দোলন-অবরোধে উত্তাল জনজাতিরা তাকে 'গুরুজী'র আসনে বসিয়ে দিয়েছিল সেদিন। কিন্তু জনজাতিদের সেই বিশ্বাস, মর্যাদা-র প্রতি সেদিন থেকেই সুবিচার করতে পারেননি শিবু সোরেন। ৯০-এর দশকে সংখ্যালঘু নরসিমা রাও সরকার-কে বাঁচাতে তিনি বহু কোটি টাকা খেয়েছিলেন। শুধু তিনিই নন, ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চার তাঁর অনেক ঘনিষ্ঠ সহযোগীও সেই টাকার ভাগ পেয়েছিলেন। এই টাকাতেই তাঁদের রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা জমজমাট হয়ে ওঠে।

শিবু সোরেনের সঙ্গে বুটা সিং এবং আরও কয়েকজনের মিলিত পরিকল্পনায় কুখ্যাত জে এম এম ঘুষ কাণ্ড সাধিত হয়েছিল। তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছিল ট্রায়াল কোর্ট। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের একটি বৈপ্যরীত্যমূলক বিচারের রায়ে (কন্ট্রোভার্সিয়াল জাজমেন্ট) এবং কোনও রহস্যময় কারণে তারা বেকসুর খালাস হয়ে যায়।

সম্প্রতি ছাঁটাই প্রস্তাবের সময় ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সাংসদের আচার-আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে কোনও টাকার খেলা রয়েছে তা প্রমাণ করা যাবে না। তারা প্রাথমিকভাবে যখন সংসদ ত্যাগ করেছিলেন, তখন সংসদীয় আচরণ বিধি সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতারই প্রকাশ ঘটেছিল। বেশ কয়েকবছর আগের একটা ঘটনা স্মরণ করুন। যখন ইউপিএ সরকারের একজন মন্ত্রী ছিলেন শিবু। আর একটি খুনের মামলায় বারংবার আদালতে হাজিরা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সমন জারি করা হয়েছিল। যদিও মন্ত্রীত্ব না ছাড়তে একপ্রকার নাছোড়বান্দাই ছিল শিবু। সেই সময় প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিজেপি সঠিকভাবে শিবুকে বরখাস্ত করার দাবীতে সরব হয়েছিল এবং এনিয়ে বিভিন্ন আন্দোলনও করেছিল। তৎকালীন শাসকদল কংগ্রেস যথাসম্ভব চেষ্টা করে গেছে যাতে বি জে পি-র এই চাপের কাছে নতিস্বীকার না করতে হয়। কিন্তু একটা সময় যখন তাদের ভাব-মূর্তি এনিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল, তখন তারা একপ্রকার বাধ্য হয়েই শিবুকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করল।

শিবু সোরেনের দুর্নীতিগ্রস্ত এই পরিচয়টার সঙ্গে পরিচিত হয়েও এবং তার সাথে নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরেও (মূলত শিবুর দুর্নীতি আর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার অপদার্থতার কথাই তুলে ধরা হয়েছিল) , আশ্চর্যজনকভাবে তার সঙ্গে নির্বাচন পরবর্তী ত্রিশঙ্কু ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় জোটে গেল বিজেপি। শুধু তাই নয় সোরেন যাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাঁচটা বছর ঝাড়খণ্ডের মসনদে কাটাতে পারেন তার সুবন্দোবস্তও করা হলো। বিজেপি-র মধ্যে এনিয়ে প্রথম থেকেই যে মতানৈক্য ছিল তা আর কোনও গোপন ব্যাপার নয়। তাদের অনেক বরিষ্ঠ

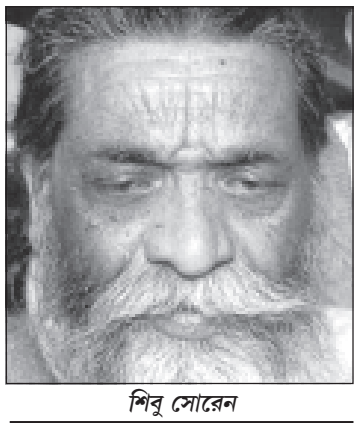
শিবু সোরেন

নেতাই শিবু সোরেন 'বিশ্বাসযোগ্যতা'র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন! হয়তো বিজেপি নেতৃত্বের এমন কোনও আশঙ্কা ছিল যে তারা সরকার গড়তে ব্যর্থ হলে কিছু সুবিধাবাদী এম এল এ হয়তো তাদের দল ছেড়ে জে এম এস প্রধানের সঙ্গে হাত মেলাবেন। কিন্তু এটা একটা বাজে অজুহাত, দল-ত্যাগ বিরোধী আইন অনুযায়ী এই কাজটা ওই সুবিধাবাদীর দল একেবারেই করতে পারত না। আরও একটা আশঙ্কা থাকতে পারে যে কংগ্রেস পার্টি হয়তো ঝাড়খণ্ড রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরতে পারে। ইতিপূর্বে তারা মধু কোড়া সরকারের সমর্থক ছিল। আসলে মুশকিলটা হয়েছিল নব নির্বাচিত কয়েকজন বিধায়ককে নিয়ে। যারা স্রেফ ক্ষমতা উপভোগ করাটাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। নইলে বিজেপি নেতৃত্ব কি সত্যিই জানতেন না যে শিবু সোরেনের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের স্বপ্ন দেখা অলীক কল্পনামাত্র!' কিংবা তারা কি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলেন যে শিবুকে দিয়ে নকশাল দমন করা আদৌ সম্ভব হবে? তাই সেদিন যে বিষবৃক্ষটি বপন করা হয়েছিল আজ তার ফল ফলতে শুরু করেছে।

বিজেপি-র সম্বিত ফিরল যখন শিবু তাদেরই আহ্বানে দিল্লী গেল আর অর্থ-বিল নিয়ে ছাঁটাই প্রস্তাবে তাদেরই বিরুদ্ধে বেমালুম ভোটটা দিয়ে এল। এতেই বিজেপি চটল আর তারপরেই ঝাড়খণ্ডের কোয়ালিশন সরকার থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। শিবু অবশ্য তার ছেলে হেমন্ত কুমার এ নিয়ে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিইয়ে এবং তার হয়ে ক্ষমা চাইয়ে পুরো জিনিসটা ম্যানেজ করার একটা চেষ্টা চালিয়েছিল। তাতেও ভবী ভুলছে না দেখে ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় জে এম এসের নেতা হেমন্ত সোরেন লিখিতভাবে রাজ্যে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকার হলে তাকে সমর্থনের কথা জানাল। বিজেপি তাতে রাজি হলে দু'পক্ষ (বিজেপি ও জে এম এস) মিলে একটা নির্দিষ্ট দিন স্থির করল। শিবু ইস্তফা দেবেন মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে এবং তাতে করে বিজেপির নতুন মুখ্যমন্ত্রীর আগমনের পথও সুগম হবে। এইবার শুরু হলো কংগ্রেসের নোংরা খেলা। সুযোগ বুঝে তাতে যোগ্য-সঙ্গত দিল শিবুও। সমস্ত কাণ্ডে যার ওপর দায়িত্বভার ছিল, শিবু-পুত্র সেই হেমন্তও তার প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থ হলো। সব মিলিয়ে বিজেপি একেবারে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল শিবু সরকারের ওপর থেকে। যার ফলে তারা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ল।

যা হলো, তাতে এক কথায় বলা যায় বিজেপির শাপে বর হয়েছে। বিজেপি ঝাড়খণ্ডের ক্ষমতায় না থাকলেও সেখানকার রাস্তাটা তাদের জন্য বরাবরই খোলা থাকবে, কারণ বিহার ভেঙ্গে ঝাড়খণ্ড নামক ছোট রাজ্যটি সৃষ্টির কৃতিত্ব তাদের একার। পরবর্তীকালে বাবুলাল মারান্ডি-র মতো নেতারা দল থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় হয়তো সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বিজেপি কিন্তু সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করলে তারা অচিরেই ঘুরে দাঁড়াবে। শিবুর সঙ্গ ত্যাগ বর্তমানে প্রেক্ষিতে একেবারে সঠিক সদ্ধিান্ত। ভবিষ্যতে এধরনের ভুল যত কম হয়, বিজেপি-র পক্ষে ততই মঙ্গল।

হিন্দু ট্যুরিজমের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পুণ্যকুম্ভের 'প্রশাসনিক' সাফল্য পাবার পর এবার হিন্দু তীর্থ পর্যটনের (হিন্দু টুরিজিম) একগুচ্ছ প্রকল্প রূপায়ণের পথে এগোল উত্তরাখণ্ড সরকার। প্রশাসনিক শীর্ষ-কর্তা রমেশ পোখরিয়ালের কাব্যিক সংমিশ্রণ নিঃসন্দেহে এতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। গত ২৮ এপ্রিল পুণ্যকুম্ভের সমাপ্তি ঘটেছিল হরিদ্বারে। তারপরেও তীর্থযাত্রীদের এখানে আসা বন্ধ হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই মলমাসেও গাড়োয়াল হিমালয়ের চারটি ধাম—বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী এবং যমুনেত্রীর দরজা আরও দিন-পনেরোর জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। মূলত দক্ষিণ ভারত থেকে আসা বহু তীর্থযাত্রী পুণ্যকুম্ভের সমাপ্তির পরেও দর্শন করতে পেরেছিলেন। দুই ঝানু প্রশাসককে নিয়ে হিন্দু টুরিজিম-কে আরও উন্নত করার স্বপ্ন দেখাচ্ছে উত্তরাখণ্ডের রাজ্য সরকার। এঁরা হলেন জগমোহন ও লেফট্যানেন্ট জেনারেল এস কে সিনহা। এঁদের মধ্যে জগমোহন অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে

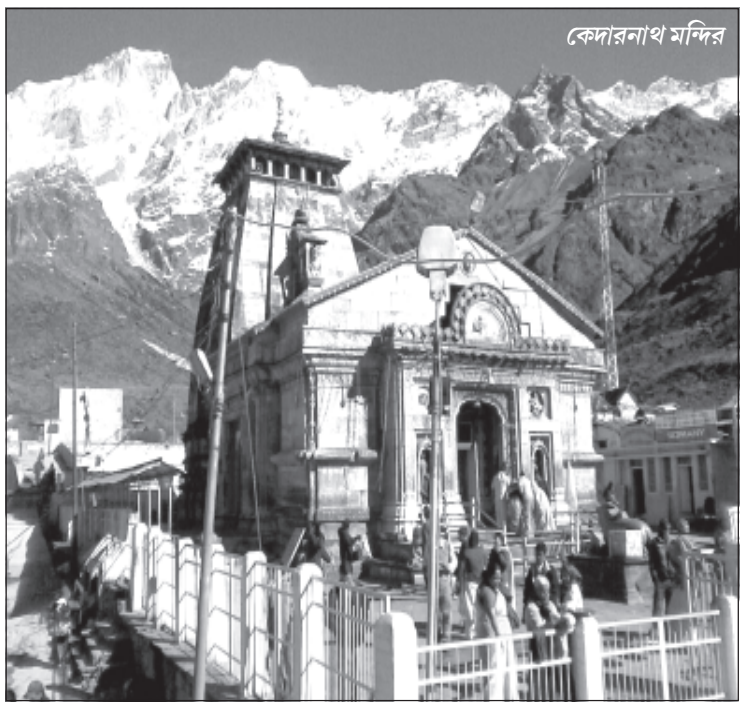
কেদারনাথ মন্দির

মন্ত্রীও ছিলেন। তখন বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে যাবার পথে তীর্থযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য দিতে একাধিক পরিকল্পনা ছকেছিলেন তিনি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মন্দির চত্বরে আগত ভ্রমণার্থীদের থেকে শুল্কের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা। ইতিপূর্বে বাজপেয়ী সরকারের মন্ত্রী থাকাকালীন জম্মুর বৈষ্ণোদেবী শ্রাইন রোজগার বৃদ্ধি করতে 'বিকল্প রোজগার'-এর বন্দোবস্তও করে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁরই পরামর্শমতো, পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তীর্থযাত্রী এবং দেবী-ভক্তদের 'ট্যাকেল' করতে একটি পেশাদারী বোর্ড গঠিত হয়েছিল সেই সময়। যার ফলে শুল্ক আদায়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মন্দির কর্তৃপক্ষের আরও একটা বিষয় হলো, উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন স্থানীয় এলাকার দরিদ্র বাসিন্দাদের বেঁচে থাকার একটা বড় ভরসা এই ভ্রমণার্থীরা। উত্তরাখণ্ড সরকারের পরিকল্পনায় স্থানীয় মানুষকে যুক্ত করে এমন একটা' টুরিজিম চেন' সাজানো হয়েছে যাতে প্রতিটি স্থানীয় বাসিন্দা লাভবান হবেন। বিশেষ করে গাড়োয়াল হিমালয়ের চারধামের আশপাশের এলাকার মানুষ একপ্রকার বেকার। চাষবাসও সেখানে তেমন হয় না। নিদারুণ অভাবের মধ্যে তাদের দিন কাটে। অন্যদিকে চারধামে আসা তীর্থযাত্রীরাও পরিকাঠামোর অভাবে ঠিক-ঠাক পরিষেবা পান না। ঠিক এই জায়গাটাই ধরতে চাইছেন জগমোহন। পরিকাঠামো নতুন করে তৈরি করতে গিয়ে স্থানীয় মানুষইকেই নিয়োগ করছেন তিনি। তার আগে তাদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণেরও বন্দোবস্ত করেছেন তিনি। তবে উত্তরাখণ্ড সরকার যতই কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কথা ভাবুন না কেন, বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে পা দিয়ে নকশাল অধ্যুষিত এলাকাগুলোর কথাও মাথায় রয়েছে তাদের। সেই কারণেই মূলত এস কে সিনহা-র নিয়োগ। বৈষ্ণোদেবীর মতোই যাত্রাপথ ঠিক করতে এক্ষেত্রে জগমোহনই ভরসা উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিঃশঙ্কের।

উত্তরাখণ্ড সরকারের এই কাজকর্ম ইতিমধ্যেই আলোড়ন ফেলেছে জাতীয় রাজনীতিতে। কংগ্রেসীরা যুক্তি দেখাচ্ছেন, হজ তীর্থযাত্রীদের কেন্দ্রীয় সরকার কোনও সাহায্য করলে বিজেপি তার নিন্দে করে। অথচ বিজেপি হিন্দু তীর্থযাত্রীদের জন্য এখন একগুচ্ছ প্রকল্প নিচ্ছে। সুতরাং হজযাত্রীদের কেন্দ্রীয় সরকারি সাহায্য নিয়ে বিজেপি-র সমালোচনাটা নাকি নেহাতই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বার্থে—এমনটাই অভিমত কংগ্রেসীদের। তবে উত্তরাখণ্ডের প্রশাসনিক কর্তারা বলছেন—নকশাল অধ্যুষিত উত্তরাখণ্ড কেন্দ্রের কাছে সেভাবে সরকারি সাহায্য পায়নি। যেটুকু পেয়েছে তা নাম-কা ওয়াস্তে মাওবাদী দমনের জন্য। সেখানকার মানুষের উন্নতিকল্পে কিন্তু কিছুই পায়নি উত্তরাখণ্ড সরকার। চাষ-বাসও সেখানে যতটুকু হয় তা নাম-মাত্র। পূর্ণ-কুম্ভ থেকে একটা বিষয় এবার শিক্ষা নিয়েছে সরকার। হিন্দু তীর্থযাত্রীর আকর্ষণ করার মতো বহু জিনিস রয়েছে পাহাড়ের প্রতিটি খাঁজে, গঙ্গার প্রতিটি বাঁকে। সেগুলোকে কাজে লাগালে অসহনীয় দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবে ছোট্ট একরত্তি রাজ্যটি। তাই ধর্মীয় কারণে যতটা

না, তার থেকে বেশি আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হিন্দু-টুরিজিমের পরিকল্পনা রূপায়ণ এগিয়েছে উত্তরাখণ্ড সরকার। প্রশাসনিক এই যুক্তির পাশাপাশি বিজেপি-র যুক্তি—ভারতবর্ষের মানুষের (যার ৭৮ শতাংশ হিন্দু) করের টাকায় বিশেষ এক সম্প্রদায়কে (পড়ুন মুসলিমদের) সুবিধা (বিনামূল্যে হজযাত্রা) দিয়ে আখেরে বারোটা বাজছে এদেশের অর্থনীতিরই।

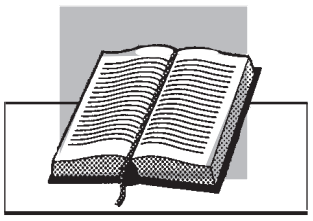

পুস্তক প্রসঙ্গ

একটি নিরাপদ সেনাবাহিনী নিরাপদ সীমারেখার চেয়ে অনেক ভাল

ইন্দ্রাণী সমাজপতি

কংগ্রেস ও তার প্রাণপুরুষ গান্ধীজীর তুলনাহীন মুসলিম তোষণ দেখে মুসলিম লীগ এবং তাদের বন্ধু বেনিয়া বৃটিশ হিন্দুদের হিমালয়সম দুর্বলতার কথা ঠিক ঠিক ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বলতে গেলে লর্ড মিন্টোর হাতে গড়া মুসলিম লীগ ১৯৪০-এ লাহোর প্রস্তাবের নামে পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ করে। তখন কমিউনিস্ট বাদে সব রাজনৈতিক দলের নেতারা বলেছিলেন, ভারত ভেঙে পাকিস্তান বানাতে দেওয়া হবে না। কিছু সংখ্যক নেতা বলেছিলেন, ভারত ভেঙে গেলে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়বে। অখণ্ড ভারত তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়েও সেদিন ডঃ আম্বেদকর কিছুটা অন্য সুরে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "একটি নিরাপদ সেনাবাহিনী নিরাপদ সীমারেখার চেয়ে অনেক ভাল"। তাঁর দৃষ্টিতে যে ভারতের সেনাবাহিনী গঠিত হবে হিন্দু এবং মুসলমান নিয়ে সেই ভারতকে প্রতিবেশি কোনও মুসলিম দেশ আক্রমণ করলে ভারতের মুসলিম সেনারা কোন পক্ষ অবলম্বন করবে?

৭১২ খৃঃ সিন্ধুর হিন্দু রাজা দাহিরের সেনাবাহিনীতে কিছু সংখ্যক মুসলমান ছিল। মহম্মদ বিন কাশিম সিন্ধু আক্রমণ করলে ওই মুসলিম সেনারা কাশিমের বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ডঃ আম্বেদকরের বিচারে মুসলিম ধর্মশাস্ত্রের বিধান অনুসারেই কোনও একটি নির্দিষ্ট দেশ হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত মাতৃভূমি হতে পারে না। কারণ, এই দু'টি জনগোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, খাদ্যাখাদ্য এবং পাপ-পুণ্যের হিসাব নিকাশ সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু গান্ধীজী এ সব সত্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তোষণের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান মিলনের তত্ত্ব দেন। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল কংগ্রেসী চোখ বুজে মেনে নিয়েছিলেন এই তোষণ তত্ত্ব। তাই তারা ১৯৪৬ পর্যন্ত তোষণের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গড়ার জন্য সম্ভব-অসম্ভব সব চেষ্টাই করেছেন। ডঃ আম্বেদকরের বিচারে এর সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হলো। কিন্তু অখণ্ডতা হারালো। খণ্ডিত ভারত হলো ধর্মনিরপেক্ষ এবং পাকিস্তান হলো ধর্মান্ধ রাষ্ট্র। সরকারি মদতে সেখানে হিন্দু-বৌদ্ধ-আদিবাসীদের উপর প্রকাশের অযোগ্য পদ্ধতিতে পাশবিক অত্যাচার করা হয়, যার ফলে আজকের পাকিস্তান হিন্দু শূন্য। প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ থেকে আজও দলে দলে হিন্দুরা চলে আসছেন এই ভারতে। এর কারণ সিংহ ভাগ মুসলমান হিন্দুদের মানুষ বলেই মনে করে না। এ সব জেনে শুনেও ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল পাল্লা দিয়ে মুসলিম তোষণের বহর বাড়িয়ে যাচ্ছে। 'মুসলিম পার্সোনাল ল' সহ বিভিন্ন প্রকার অনৈতিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অঞ্চল পঞ্চায়েতের নিম্নতম পদ পর্যন্ত পেতে পারে একজন মুসলমান। একজন মুসলমান বিচারক এক সঙ্গে চার জন বিবাহিতা স্ত্রী এবং তার সঙ্গে অসংখ্য দাসীর সেবা গ্রহণ করতে করতেই কোর্টে গিয়ে

ডঃ আম্বেদকর

দ্বিতীয়বার বিয়ে করার অপরাধে একজন হিন্দুকে শাস্তি দিতে পারে। এরপরেও প্রখ্যাত মওলানারা টি. ভি. চ্যানেলে দাঁড়িয়ে হুমকির সুরে বলছেন, 'আপনারা আমাদের মুসলমানদের উপর ইনজাস্টিস করছেন। এই ইনজাস্টিস বন্ধ করুন। অন্যথায় আমরা জেহাদ করব, জেহাদ আমাদের ধর্মের অঙ্গ। কেউ আটকাতে পারবেন না। এই হুমকির পরেই 'অসত্য ইনজাস্টিস' তত্ত্বকে 'সত্য' বলে স্বীকার করে নিলেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং মুসলমানদের আরও সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেবার জন্য সাচার কমিটি এবং রঙ্গ নাথ মিশ্র কমিশন বসিয়ে ইচ্ছে মতো রিপোর্ট তৈরি করানো হলো। এই রিপোর্ট কার্যকরী করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কিছুটা 'ধীরে চলো নীতি' নিলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার তড়িঘড়ি মুসলমানদের জন্য প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে শতকরা ১০ ভাগ সংরক্ষণের ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন। কিন্তু এই অনৈতিক এবং সংবিধানবিরোধী কাজ যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ আরও বাড়বে এবং সেই বিভেদ যে ভারতের সংহতিকে বিপন্ন করে তুলবে আমাদের রাজ্য সরকার তা ভাবতেই চাননি।

ধর্মের ভিত্তিতে যে কোনও মানুষকে সংরক্ষণ দেওয়া যায় না, এ কথা জেনেই আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আড়াই কোটি মুসলমানদের মধ্যে দু'কোটিকে ও-বি-সি কোটায় এনে সংরক্ষণ দেবেন। এই অনৈতিক, অবৈজ্ঞানিক এবং বিভেদ সৃষ্টিকারী সিদ্ধান্তের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন আম্বেদকর অনুরাগী বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক দেবজ্যোতি রায় আলোচ্য বইটিতে। তিনি তোষণ নীতির সমালোচনা করতে গিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেছেন, এই শিক্ষা ব্যবস্থা চরম সাম্প্রদায়িক যার মধ্যে পরধর্ম সহিষ্ণুতা নেই। ডঃ আম্বেদকর স্টাডি সার্কেলের পক্ষে শ্রীরায় বলেছেন, ভারতের জন্য আমরা সেই শিক্ষা ব্যবস্থা চাই, যে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি ভূমি হবে দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা এবং পরমধর্ম সহিষ্ণুতা'। সহজ অথচ গতিশীল ভাষায় মূল সমস্যাটিকে অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন লেখক।

বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ বলেছেন, 'মুসলিম তোষণ এবং হিন্দু ধর্মের দুর্বলতার বিরুদ্ধে অন্যতম সাহসী এবং যুক্তিপূর্ণ যোদ্ধা ছিলেন ডঃ আম্বেদকর।...মেধার বিচারে দেবজ্যোতিবাবু ডঃ আম্বেদকরের যোগ্য ছাত্র এবং সাহসিকতার বিচারে তিনি বাবাসাহেবের সার্থক অনুগামী'।

বইটিতে কয়েকটি বানান ভুল রয়ে গেছে। ১৯০৬ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত মুসলিম রাজনীতির গতি প্রকৃতি সম্পর্কে আরও বিবরণ থাকলে অনেক পাঠক অধিকতর তৃপ্তি পেতেন।

প্রচ্ছদে ডঃ আম্বেদকরের রঙিন ছবি এবং তার সঙ্গে বাবাসাহেবের অতি মূল্যবান এই উদ্ধৃতিটি 'একটি নিরাপদ সেনাবাহিনী নিরাপদ সীমারেখার চেয়ে অনেক ভাল' ব্যবহার করে লেখক এবং প্রকাশক তাঁদের সঠিক চিন্তাধারার পরিচয় রেখেছেন। এত মূল্যবান উক্তি এ পর্যন্ত কেউ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

'ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ ঃ একটি সর্বনাশা পদক্ষেপ'
লেখক ঃ শ্রীদেবজ্যোতি রায়।
ভূমিকা ঃ ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ।
প্রাপ্তিস্থান ঃ তুহিনা প্রকাশনী,
১২-সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩
মূল্য-১২ টাকা।

ভ্রমণ কাহিনী হয়েও উপন্যাসের গুণে সমৃদ্ধ

গোপাল চক্রবর্তী

লালঠাকুরের লেখা "অমৃতকুম্ভ কথা" পুরাণ, ইতিহাস, ভূগোল এবং কিংবদন্তী আশ্রিত এক মহামূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থটির চার পর্বে যথাক্রমে হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক এবং উজ্জয়িনীর কুম্ভ মেলা এবং স্নানের উপভোগ্য বর্ণনা আছে। পৌরাণিক কাহিনী হলো সমুদ্র মন্থনের পর ইন্দ্রসুত জয়ন্ত অমৃতকুম্ভ দানবদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য কুম্ভ নিয়ে পলায়ন করেছিলেন। পশ্চাতে ধাবমান অসুরকুল। জয়ন্ত পলায়ন পথে মোট দ্বাদশবার অমৃতকুম্ভ ভূমিতে রেখে ছিলেন। এছাড়া আটবার দেবলোকে এবং চারবার মর্ত্যলোকে। মর্ত্যলোকের এই চারস্থানই হলো হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক এবং উজ্জয়িনী। লেখক পরপর চারটি কুম্ভমেলা দর্শন এবং বিশেষ বিশেষ যোগে কুম্ভ স্নান করেছেন। "অমৃত কুম্ভ কথা" মূলত ভ্রমণ কাহিনী হলেও যাত্রাপথের বর্ণনার গুণে এবং এক একটি কুম্ভমেলার ঘটনা প্রবাহের বর্ণনায় গ্রন্থটি উপন্যাসের গুণে সমৃদ্ধ হয়েছে।

কুম্ভমেলায় লেখক প্রচুর সাধুসঙ্গ করেছেন। কাহিনীর বিন্যাসে সাধু মহাত্মাদের বিভিন্ন উক্তি, বক্তব্য, মন্তব্য যেমন পরিবেশন করেছেন তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে নিজস্ব মতামতও ব্যক্ত করেছেন। হরিদ্বার পর্বের যাত্রাপথ ঘটনার ঘনঘটা এবং বর্ণনার আলোর ছটায় যথেষ্ট উপভোগ্য। তেমনি কুম্ভ মেলার ঘটনা প্রবাহ ছবির মতো পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণ এবং বিশিষ্টজনদের মতামতের ভিত্তিতে গঙ্গার পবিত্রতা ও গঙ্গাজলের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করেছেন। কুম্ভমেলার সরকারি পরিষেবার যে নিখুঁত পরিসংখ্যান এবং কুম্ভমেলায় বারবার হওয়া দুর্ঘটনা সমূহের বিবরণ ও মূল কারণগুলি লেখক অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। প্রয়াগপর্বের ঘটনার বিন্যাসও সুখপাঠ্য। লেখকের ভ্রমণপিপাসু মনের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার যোগ থাকায় রচনাটি ভক্তপাঠকদের মনে ভক্তিরসেরও সঞ্চার করে। আধ্যাত্মিকতা থাকলেও লেখক কুম্ভদর্শনের সময় চোখ কান যথার্থভাবে খোলা রেখেছিলেন ভক্তির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেননি। স্থান বিশেষে লাল ঠাকুরের ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক বর্ণনা তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক।

বৃহস্পতি ও ভাস্কর উভয়ে কুম্ভরাশিতে গমন করলে নাসিকের গোদাবরীতে কুম্ভযোগ হয়। রামলক্ষ্মণ সীতার স্মৃতিধন্য নাসিক অঞ্চল। লেখক সেই সুদূর অতীতকে পাঠকের সামনে মূর্তিমান করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে গভীর অধ্যবসায়ে মেলাস্থলের আধুনিক পৌর পরিষেবার নিখুঁত চিত্রও তুলে ধরেছেন। অমৃত কুম্ভকথার শেষপর্ব 'উজ্জয়িনী পর্বের' বর্ণনাও মনোজ্ঞ। উজ্জয়িনীর নাম শুনলেই মহাকবি কালিদাসের কথা মনে পড়ে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বহু যুগের ওপার থেকে ভেসে আসা বিরহী যক্ষের মর্মবেদনার ভারাক্রান্ত আষাঢ়ের নবীন মেঘের ছবি। ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অন্যতম সাক্ষী এই প্রাচীন নগরী। মহাকুম্ভযোগে এই নগরীর বিচিত্র রূপটি লেখক নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে।

রোমান্টিক, সুদর্শন লেখক লালঠাকুরের নায়িকা ভাগ্যও খুব ভাল বলতে হয়। কারণ প্রতিটি কুম্ভস্নানে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে রূপে গুণে অনন্যা উর্বশী, রাধারাণী ভানুমতীর মতো নায়িকাদের। এঁদের আবির্ভাবে 'অমৃতকুম্ভ কথা" আরও সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। তবে এই রচনায় ত্রুটি যে নেই তা নয়। ভাষার সাবলীলতা কোথাও কোথাও রক্ষিত হয়নি। স্থান বিশেষে শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও লেখকের অসতর্কতার জন্য রচনার গাম্ভীর্য নষ্ট হয়েছে। মুদ্রণ বিভ্রাটের জন্যও কোথাও কোথাও পাঠককে বিভ্রান্ত হতে হয়। প্রচ্ছদ এবং মলাট সুদৃশ্য, ছাপাও ঝকঝকে। কুম্ভমেলার বিভিন্ন পর্বের ছবিগুলিও মনোরম এবং তথ্য সমৃদ্ধ। কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়েও 'অমৃতকুম্ভ কথা' একটি সার্থক গ্রন্থ।

অমৃতকুম্ভ — লাল ঠাকুর, প্রাপ্তিস্থান — ঘোষ অ্যাণ্ড চক্রবর্তী। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩ মোঃ ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮

সাম্প্রদায়িক বিভাজনের নতুন চক্রান্ত

অভিরূপ শর্মা।। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু তোষণ— 'সাম্প্রদায়িক বিভাজনের নতুন চক্রান্ত' নামক একটি পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতা লগ্নের সময়কার হিন্দুরা বইটি পড়লে সিঁদুরে মেঘের সন্ধান পাবেন নিঃসন্দেহে। বইটির প্রকাশক অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। শ্রীসত্যান্বেষী ছদ্মনামে তা লেখা হয়েছে। কিন্তু যে সত্য তাতে তুলে ধরা হয়েছে তা যেমন ভয়ানক তেমনি মর্মান্তিক।

বর্তমান রাজ্য সরকার এমনকী বিরোধী দলগুলির মুসলিম তোষণ নীতির সম্পর্কে কম-বেশি প্রায় সকলেই অবগত রয়েছেন। কিন্তু বইটিতে এ সংক্রান্ত এমন কিছু অজানা তথ্য রয়েছে যা পাঠককে বিস্ময়ে হতবাক করে দেবে, ভাবতে বাধ্য করবে যে সংখ্যালঘুর নামে মুসলিম তোষণের প্রয়াস এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এতটা নগ্ন হতে পারে! যেমন ধরা যাক, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। ২০০৭ সালে বিধানসভায় আলিয়া ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট পাশ করিয়ে কলকাতা মাদ্রাসাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে— এইটুকুই আমাদের জানা। কিন্তু কেউ কি জানেন, ওই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদের সরকারিভাবে আরবি প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন, উপাচার্যকে বলা হচ্ছে মজলিস-ই-তালিমি, আচার্য হলেন আমির-ই-জামিয়া। আরও কোনও পদাধিকারীর জন্য কি প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে তার বিস্তারিত ফিরিস্তিও দেওয়া হয়েছে বইটিতে।

বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে এই রাজ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার হালচাল সংক্রান্ত অনেক অজানা তথ্য। উর্দু ভাষা সংক্রান্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর প্রমোশন অব উর্দু ল্যাংগোয়েজ-এর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের মুসলিম তুষ্টিকরণ নীতির ব্লু-প্রিন্টও দেখানো হয়েছে তাতে। বইটির বৈশিষ্ট্য— পয়েন্ট অনুযায়ী নিখুঁতভাবে পশ্চিমবঙ্গে তথাকথিত সংখ্যালঘু তোষণের কারণে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের চক্রান্তজনিত প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর ওপর আলোকপাত করা। একইভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে বৃত্তি, হোস্টেলসহ অন্যান্য কী ধরনের অন্যায় সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে মুসলিমদের তাও দেখানো হয়েছে। বইটির প্রকাশক বিদ্যার্থী পরিষদ বলে শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই মুসলিম তোষণের প্রয়োগ দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। দেখিয়েছে হজ, ওয়াকফ বোর্ড', আবাসন, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানে কি নগ্ন আকারের মুসলিম তোষণ হচ্ছে। আসলে ১৮৮২ সালে হান্টার থেকে ২০০৬ সালে সাচার কমিশন পর্যন্ত মুসলিম তোষণের ট্রাডিশনের কথাই ঘুরেফিরে এসেছে পুস্তিকাটিতে। সবচেয়ে বড় কথা এনিয়ে রাজ্য সরকারের বেশ কিছু গোপন পরিকল্পনার কথাও ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে এই বইটিতে। যেমন রাজারহাটে সংখ্যালঘুদের জন্য নির্মীয়মান আবাসনের মডেল-এর সচিত্র পরিচয়।

পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু তোষণ— সাম্প্রদায়িক বিভাজনের নতুন চক্রান্ত।

লেখক — সত্যান্বেষী।

দাম ঃ ৭ টাকা।

বইটি পাবেন বিদ্যার্থী পরিষদ প্রাদেশিক কার্যালয়, ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬-এ।

রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীকরণ সূচী

জাতীয় গৌরব না লজ্জা ?

এস গুরুমূর্তি

এসময় সারা দেশজুড়েই জনগণনা হচ্ছে। এরই ভিত্তিতে তৈরি হবে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীয়ন সূচী বা ন্যাশানাল পপুলেশন রেজিস্টার—সংক্ষেপে এন পি আর। আমাদের দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম্ এই ঘটনাকে 'জাতীয় গৌরব' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। সেইজন্যই প্রশ্ন উঠেছে এটা গৌরবের না লজ্জার? একটু তলিয়ে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখলেই এর তাৎপর্য বোঝা যাবে। মহামান্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেছেন, "মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ এক বৃহত্তম ঘটনার দ্যোতক। কারণ—পৃথিবীর কোনও দেশেই সরকারিভাবে এক বিলিয়ন (একশত কোটি)-র বেশি নাগরিককে গণনা করা, এবং তারপরে পরিচয়পত্র দেওয়ার মতো দুরূহ কাজ করেনি।" তিনি তাঁর বক্তব্যে সঠিক। পাটীগণিতের হিসেবে অঙ্কটা অনেক বড় সন্দেহ নেই। কিন্তু ভিতরের ব্যাপারটা যদি বের হয়ে পড়ে তাহলে তা রীতিমতো লজ্জার (জাতীয় লজ্জা) ব্যাপার বলেই গণ্য হবে। কেননা এখানে রয়েছে নিরাপত্তা সংক্রান্ত এক সাঙঘাতিক ঝুঁকি। এককথায় রাষ্ট্রবিরোধী।

সাধারণভাবে এন পি আর (ন্যাশন্যাল পপুলেশন রেজিস্টার) এক স্বাগতযোগ্য পরিকল্পনা। একটি জাতি (নেশন) তার নাগরিকদের বিস্তারিত বিবরণ নথিবদ্ধ করে রাখবে—এটাই স্বাভাবিক। তবে আর যাই হোক—এন পি আর হলো জনসংখ্যার তালিকা, নাগরিক তালিকা নয় (NRP will be a population register, not a citizenship register—। এদেশে মাথা গোনা বসবাসকারীদের সংখ্যা, তার মধ্যে দেশী, বিদেশী, ভারতীয় এবং অভ্যাগত, যারা বহুদিন যাবৎ বাইরে থেকে এসে ভারতবর্ষে বহাল তবিয়তে বসবাস করছে তাদেরও সংখ্যা গোনা হবে। সমস্যাটা এখানেই। সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য জুড়ে জাঁকিয়ে বসবাস করছে বাংলাদেশীরা। যা ভারতের নিরাপত্তা ও অখণ্ডতার ক্ষেত্রে ভয়াবহতম বিপদ। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতামতটা এরকমই। ২০০৩-এ তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নাণ্ডেজ বলেছিলেন, ২ কোটি বাংলাদেশী ভারতবর্ষ জুড়ে বসবাস করছে। এই অবৈধ বসবাসকারীরা পশ্চিমবঙ্গ , অসম, বিহার, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর তো বটেই—এমনকী মুম্বাই এবং দিল্লীর জনসংখ্যাগত ভারসাম্য বিগড়ে দিচ্ছে। এই বাংলাদেশীদের কারণে পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলো বিগত দু'দশক ধরে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বা তার কাছাকাছি। ওই বাংলাদেশীদের সংখ্যাটা অস্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলঙ্কার মোট জনসংখ্যার সমান। পৃথিবীর ১৬৭টি দেশের জনসংখ্যা আলাদা করে ধরলে তা ভারতে ঢুকে পড়ে গেঁড়ে বসা বাংলাদেশীদের তুলনায় কম। পৃথিবীর অনেকগুলো দেশের জনসংখ্যা একত্র করলে তাও ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশী-দের তুলনায় কম হবে।

বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত ইসলামিক জেহাদি সন্ত্রাসবাদের একটা মূল কেন্দ্র অবশ্যই বাংলাদেশ, এবং তা দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে—ক্ষমতায় যেই থাকুক না কেন। একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই প্রবণতা ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক।

ভারতে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের বিষয়ে কানাডার ওন্টারিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান শ্রীমতী সুজাতা রামচন্দ্রণ এক সমীক্ষা করেছেন। তিনি আবার আন্তর্জাতিক অভিবাসন বিষয়ক বৈশ্বিক কমিশনের সঙ্গেও যুক্ত। তিনি এক ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে সমীক্ষা করেছেন। অন্যান্য গবেষকরা আন্তর্জাতিক অভিবাসন বিষয়ে যে গবেষণা বা সমীক্ষা করে থাকেন তা থেকে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীমতী রামচন্দ্রণ। অন্যরা যেখানে এধরনের ঘটনাকে 'অ্যাসাইলাম সীকার্স' (আশ্রয় সন্ধানী) এবং অবৈধ অভিবাসী বলেই ক্ষান্ত সেখানে সৃজাতা কিন্তু বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশী বিষয়ে সাবধান করেছেন। বাংলাদেশকে তিনি কার্যত 'অভিবাসী তৈরির কারখানা' বলে অভিহিত করেছেন। শ্রীমতী রামচন্দ্রণ আরও জানিয়েছেন, "বাংলাদেশ থেকে ভারতবর্ষে অভিবাসী পাঠানোর জন্য রীতিমতো সিণ্ডিকেট, দালালচক্র টাকা নিয়ে কাজ করে। এই নেটওয়ার্ক ভারতব্যাপী সক্রিয় ('Manpower' agencies, recruiters, touts, brokers, 'travel-agents and other agencies)। দালালরা টাকার বিনিময়ে কাজ দেওয়ার নাম করে বাংলাদেশীদের ভারতে এনে ছড়িয়ে দেয়। সাম্প্রতিককালে দালালরাই পুলিশের (ভারতীয়) হাতে ধরা পড়া থেকে বাংলাদেশীদের বাঁচাতে বৈধ ভারতীয় নথিপত্র তৈরি করিয়ে হাতে ধরিয়ে দেয়। তার মধ্যে রেশন কার্ড, সচিত্রভোটার আই ডি থেকে পাসপোর্ট পর্যন্ত সবই রয়েছে।

দালালদের দাপট এতটাই। সেজন্য এটা মোটেই আশ্চর্যের নয় যে বহু বাংলাদেশী খাতায় কলমে ভারতের বৈধ নাগরিক হয়ে স্বচ্ছন্দে বসবাস করছে।"

ওই দালালরা প্রকৃতপক্ষে অনেক সময়ই বাংলাদেশীদের প্রতারণা করে। সুজাতা রামচন্দ্রণ উল্লেখ করেছেন, তিন লক্ষাধিক বাংলাদেশী মেয়েরা ব্রথেলে (বেশ্যালয়ে)

প্যালেস্তানীয় অনুপ্রবেশকারীদের ইজরায়েলের বেড়া

বসবাস করছে। দু'কোটির বেশি বাংলাদেশী যে দেশ ছেড়ে পাশের দেশে ঢুকে পড়েছে তা তো বাংলাদেশ সরকারের অজানা নেই। তবুও বাংলাদেশ সরকার বারবার দাবী করে এসেছে যে, একজনও বাংলাদেশী ভারতে আদৌ অনুপ্রবেশ করেনি। ভারতে একজনও বাংলাদেশী অভিবাসী নেই। দু'দেশেই বসবাসরত বাঙালীদের মধ্যে বেশভূষা, ভাষা, চাল-চলনে বেশ মিল। ভারতে একবার ঢুকে পড়লেই হলো! একজন অবৈধ বাংলাদেশী এবং একজন বাঙালীর মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সুজাতা তাঁর সমীক্ষায় বলেছেন, রাজনৈতিক নেতা ও ভ্রষ্ট সরকারি অফিসারদের দৌলতে 'ভারতবাসী' প্রমাণ করার যাবতীয় প্রমাণ অবৈধ বাংলাদেশী অভিবাসীদের কাছে সবসময়ই অত্যন্ত সুলভ। সত্তরের দশকের শেষদিকে অসমের ছাত্ররা জনসংখ্যাগত ভারসাম্য পরিবর্তনের বিরুদ্ধে একরকম বিদ্রোহ করে। কিন্তু আন্দোলনকারী ছাত্রদের ১৯৮৩ সালে 'আই এম ডি টি' নামক আইনের চুষিকাঠি ধরিয়ে ইন্দিরা গান্ধী সরকার চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেন। ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়।

আই এম ডি টি আইনে পুলিশ বা অভিযোগকারীকেই প্রমাণ করতে হোত অভিযুক্ত ব্যক্তি বিদেশী বা বাংলাদেশী কিনা! অথচ তার আগেকার প্রচলিত ফরেনার্স অ্যাক্টে অভিযুক্তকেই প্রমাণ করতে হোত সে ভারতীয়, বিদেশী নয়। ২০০১ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত অসম সরকার ১৭০ কোটি টাকা খরচ করে ৯,১৪১ জন বাংলাদেশীকে সনাক্ত করে। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র ১,৮৬৪ জন বাংলাদেশীকে ভারত থেকে বহিস্কার করতে দীর্ঘ ছয়বছর সময় লেগে যায়। মাথাপিছু খরচ এক লক্ষ আশি হাজার টাকা। এই হিসাবে দু'কোটি বাংলাদেশীকে ফেরৎ পাঠাতে সময় লাগবে ৬৪,২৭৮ বছর এবং খরচ হবে ৩৬ লক্ষ কোটি টাকা।

এখন দেখার বিষয় হলো, এন পি আর' কি মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে? 'এন পি আর' তৈরি হওয়ার কথা ১ এপ্রিল থেকে ১৫ মে, ২০১০-এর মধ্যে। সম্ভাব্য খরচ ৩,৫৯০ কোটি টাকা। প্রতিটি ভারতবাসীর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগৃহীত হওয়ার ব্যাপার রয়েছে। এরমধ্যে 'জাতীয়তা' বা ন্যাশনালিটিও আছে। অন্ততঃপক্ষে জনগণনার ফর্ম নং ১১-তে সেকথাই বলা হয়েছে।

প্রশ্ন করলে কি অবৈধভাবে বসবাসকারী কোনও বাংলাদেশী নিজেকে আমেরিকান বা ইংরেজ বলে প্রতিপন্ন করতে চাইবে? নিশ্চয়ই নয়।

ফলে ২ কোটি অনুপ্রবেশকারী তাদের ঘোষণা মতো ভারতীয় হিসেবেই লিপিবদ্ধ হবে। একবার এন পি আর-এ নথিভুক্ত হয়ে গেলে নাগরিক সচিত্র পরিচয়পত্র এবং ইউ আই ডি (Unique Identification Document—ÎÂóËûþ û±Ëõ¼ ÎðËõ Unique Identification Authority of India-কর্তৃপক্ষ।

এখন দেখা যাক অন্যান্য দেশ কি করছে? যখনই কোনও অবৈধ অভিবাসী বেআইনীভাবে দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে তখন সেই দেশের কর্তৃপক্ষ কী ব্যবস্থা নেয়। উত্তর কোরিয়া এরকম অনুপ্রবেশকারীদের বারো বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়, ইরান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী করে রাখে, আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশকারীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সৌদি আরব জেলে পোরে, চীনে বেআইনীভাবে কেউ ঢুকলে তাকে আর পাওয়া যায় না। কানাডা তিন বছর এবং ফ্রান্স পাঁচবছর জেলে বন্দী করে রাখে। ভেনিজুয়েলা তাদেরকে কিমা মশলা (স্পাইস) বানিয়ে তাদের চিরতরে শেষ করে দেয়। মেক্সিকো এবং কিউবা জেলে ভরে রাখে।

এখন অনুমান করুন। চোরের মতো চুপিসারে যে দু'কোটি বাংলাদেশী ভারতে ঢুকে বহাল তবিয়তে বসবাস করছে, নিত্য-প্রতিদিন সংখ্যা বৃদ্ধি করছে তাদের নিয়ে ভারত কী করবে? কি করা উচিৎ? এদেশে তাদেরকে রেশন কার্ড দেওয়া হচ্ছে, ভর্তুকিতে খাবার দেওয়া হচ্ছে, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ক্রেডিট কার্ড, ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড, হজ-সাবসিডি, সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ ও নানারকম ঋণ (মুসলমানদের) দেওয়া হচ্ছে। এবার আইনমাফিক নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে সেই সঙ্গে ইউ আই ডি অতিরিক্ত। এসবের পরে পরিসংখ্যান দিয়ে বলা হবে, ভারতে কোনও বাংলাদেশীই নেই। তার ফলে বন্যার স্রোতের মতো বাংলাদেশীরা ভারতে প্রবেশ করবে। ফ্লাড গেট খুলে যাবে। লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশীরা ঢুকে পড়বে। ঘাবড়াবেন না, ২০২১-এ এন পি আর-এর ভিত্তিতে তারা ভারতে বিধিবদ্ধ নাগরিকত্বের দাবীদার হবে।

শ্রীমতী সুজাতা সঠিক শব্দ ব্যবহার করেছেন—এই বাংলাদেশীদের সম্বন্ধে ভারতের মনোভাবকে তিনি তুলনাহীন, নির্বীয, নির্বিকার বলে অভিহিত করেছেন। এন পি আর-এর মধ্য দিয়ে বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ-সরকারের বাংলাদেশীদের ভারতীয় নাগরিক বানানোর ব্যাপারে "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্"-এর আভাস পরিষ্কার। ভারতের ভবিষ্যৎ ও নিরাপত্তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কি এক জঘন্য ষড়যন্ত্র! কেউ কি এটা দেখতে বা শুনতে পাচ্ছেন?

লেখক একজন
বিশিষ্ট স্তম্ভলেখক।
সৌজন্যে ঃ দি সেন্টিনেল

গ্রাহকদের জন্য

স্বস্তিকার সডাক্ বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ২০০.০০ টাকা। বিশেষ সংখ্যাগুলি সমেত।

স্বস্তিকার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ নাম ও ঠিকানা (পিন কোড নম্বর সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। বছরে যেকোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

পত্রালাপের সময় অবশ্যই আমাদের দেওয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। মনে রাখবেন গ্রাহক নম্বরের পাশেই যে তারিখটি লেখা হয় সেই তারিখেই আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অতএব উক্ত তারিখের পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক গ্রাহক মূল্য জমা দিয়ে গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণ করতে হবে।

স্বস্তিকা দপ্তর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সময়মতো পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন। বারবার ডাকের গোলমাল হলে Chief Post Master General, West Bengal Circle, Yogajog Bhawan, P-36, C.R. Avenue, Kolkata - 12 — এই ঠিকানায় লিখুন। — ব্যবস্থাপক

সংখ্যালঘু সংরক্ষণ

'মুসলিম সংরক্ষণ ঃ সেকাল-একাল' প্রসঙ্গে (স্বস্তিকা, ২৬.৪.১০) অরিন্দম মুখোপাধ্যায় বলেছেন—১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তি এবং ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জনের বেঙ্গল প্যাক্টে যথাক্রমে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা এবং চাকুরিতে সংখ্যানুপাতের অতিরিক্ত সংরক্ষণ মেনে নেওয়া হয়। বেঙ্গল প্যাক্টের ক্ষেত্রে অরিন্দমবাবুর বক্তব্যে বিভ্রান্তির অবকাশ আছে। কারণ, বেঙ্গল প্যাক্টের খসড়াতেও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রস্তাব ছিল। ('Representation in the Legislative Council on the population basis with separate electorates')। উপরন্তু, প্রস্তাব ছিল—মসজিদের সামনে কোনও সংগীত চলবে না ('No music should be allowed before the mosque'), এবং গো-কোরবানিতে বাধা দেওয়া চলবে না ('...no interference with cow-killings for religious sacrifices')। চিত্তরঞ্জন দাসের উদ্যোগে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তৈরি 'Bengal Pact' নামে পরিচিত প্রস্তাবের খসড়াটি ১৯২৩ সালের কোকনদ কংগ্রেস অধিবেশনে দীর্ঘ উত্তপ্ত বিতর্কের পর ৪৫৮-৬৭৮ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক বৈরীভাব দূর করার লক্ষ্যে ১৯১৮ সালের দিল্লি কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডাঃ আন্সারী ও লালা লাজপত রাই-এর তৈরি করা Indian National Pact-এর খসড়াও বিবেচনার জন্য কোকনদ অধিবেশনে জমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, Bengal Pact-এর খসড়া প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যাওয়ার পর ওই বিষয়টা নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। দেশের দুর্ভাগ্য, বিশ শতকের গোড়াতে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যে প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছিলেন, ইতিহাস-অনভিজ্ঞ, অপরিণামদর্শী কংগ্রেসী নেতারা আজ তা বলবৎ করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

গণপরিষদেও (Constituent Assembly) মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ-এর দাবি উঠেছিল। গণপরিষদ সদস্য নাসিরুদ্দিন আহমেদ সেখানে বলেছিলেন, 'ছোটভাই' মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ-এর ব্যবস্থা না রাখলে আমরা তাদের প্রীতি-ভালবাসা হারাব। সে কথার জবাবে সর্দার প্যাটেল চাঁচাছোলা ভাষায় বলেছিলেন—"New nation of India will not tolerate disruptive tendencies in any form. Mr. Naziruddin Ahmed has said that we will lose the affection of the younger brother if we do not accept his ammendment requiring reservations for the Muslims in India. I am prepared to lose it (the affection of the younger brother), because otherwise it will prove to be the death of the elder brother. Remember, you are the people who are responsible for Pakistan and not those who live in Pakistan. You led the agitation. What is it you want now? We do not want the country to be divided again." (সূত্র ঃ Hindu Resurgence–March April, 2009.)। (অর্থাৎ, 'ভুলে যাবেন না, পাকিস্তানে যাঁরা বাস করছেন তাঁরা নন, আপনারা 'ছোট ভাইয়েরা'-ই পাকিস্তানের দাবিতে আন্দোলন করেছেন। কাঁদুনি গেয়ে লাভ নেই। আপনাদের ভালবাসা আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা চাই না, দেশ আবার খণ্ডিত হউক')।

—বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা।

সীমান্ত রক্ষী ও নেতারা

দেশের সীমান্ত রক্ষীরাই পারে একটি দেশের নিরাপত্তা দিতে। সীমান্ত রক্ষীর উপরই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সীমান্তে যাতে কোনও রকম অঘটন না ঘটে। যদি কোনও কারণে অঘটন ঘটে তার সমাধান সীমান্ত রক্ষীরাই করবে। কিন্তু কোনও কোনও সময় এমন ঘটনা ঘটে যে সাধারণ মানুষও সীমান্ত রক্ষীর উপর চড়াও হয়। এর কারণও সকলের বুঝতে অসুবিধা হওয়া উচিত না। এমনই ঘটনা ঘটে গেল কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমায় বালাভুত অঞ্চলে ঘুঘুরতলা শিয়ালপাড়া গ্রামে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে (বি. এস. এফ) বাহিনী জোয়ানদের গুলিতে দুই ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু। মৃত্যুর কারণ কি? গরুগুলিকে পারাপার করার অনুমতি দিয়ে পুনরায় গরুগুলিকে আটকে দেওয়া। কিন্তু আপনারা সবাই জানেন গরু পাচারকারীরা রীতিমতো বি. এস. এফ-দের সাথে লড়াই চালায়। নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য তারা গুলি চালাতে বাধ্য হয়। গুলিচালনার বিনিময়ে এক মুসলমান মহিলা এবং শিশুর মৃত্যু হয় এবং সেইসঙ্গে বেশ কয়েকজন আহত।

বিধায়ক তমসের আলি থেকে শুরু করে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা দাপাদাপি শুরু করে দেয়। কিন্তু এই রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন হলো—আজ আপনারা যদি বি. এস. এফের জায়গায় কাজ করতেন তাহলে কি করতেন? সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব যাদের তাদেরকে যদি স্বাধীনতা না দেওয়া হয় তাহলে অচিরেই সীমান্ত নামক শব্দটি উঠে যাবে। দোহাই রাজনৈতিক নেতাদের, সরকারি নীতির সমালোচনা করা যায়, সীমান্ত রক্ষীকে শাস্তি দেওয়া যায়, সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বটি উড়িয়ে দেবেন না।

সীমান্তে গরু পাচার, নারী পাচার, জালনোটের কারবার, অহরহ অবাধ অনুপ্রবেশ, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বাংলাদেশে চালান, পশ্চিমবাংলা থেকে ১ টাকার কয়েন উধাও সহ আরও নানান সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক নেতাদের কাজ নয় কি?

—জয়রাম মণ্ডল, নয়াবস্তি, জলপাইগুড়ি।

মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য

১৯৫০ সাল থেকে নবগঠিত 'ভারত' (Indian union of states) রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে আসছে পবিত্র ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশ ও ভাবনা অনুসারে। সংবিধানে ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ছয়টি 'মৌলিক অধিকার' স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে সেখানে দশটি 'মৌলিক কর্তব্য'-এর কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ অধিকার লাভের জন্য অধিকতর কর্তব্য পালনের প্রয়োজন রয়েছে। পরিতাপের বিষয় এই যে, ভারতের মুসলমান সমাজ অধিকারের ক্ষেত্রে ছয়ের উপর আরও দশ দাবি করে (যা তারা অনেকাংশে পেয়েও থাকে);কর্তব্য পালনের ভাঁড়ারে পড়ে থাকে শূন্য। ফলে নাগরিকত্ব 'ভারতীয়তা' হলেও সুযোগ-সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রকর্তব্য না পালনে দেশের মানুষের এক বড়ো অংশ 'মুসলমান'!

এই মানসিকতার বীজ লুকিয়ে রয়েছে হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত 'ইসলাম' নামক মতবাদে। এই রাজনৈতিক মতকে 'ধর্ম' বলে চালানোর পাশ্চাত্য অপচেষ্টা আমাদের দেশের তাবৎ মহাপুরুষরা বুঝতে পারেননি। সত্যিই, অবাক লাগে যখন দেখি আমাদের দেশের বিজাতীয় নেতৃত্ব একটি মহান মানবধর্মের সঙ্গে রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী নীতির সমন্বয় করতে সচেষ্ট হয়।

—সুকান্ত আওন, জামালপুর, বর্ধমান।

হিন্দুর শত্রু

ভারতে হিন্দু বলে পরিচিত যে জাতির বসবাস এদের বুঝে ওঠা বড়ই কঠিন। যে বাঙালি হিন্দুরা বাংলাদেশ থেকে মুসলমানের তাড়া খেয়ে ভারতে পালিয়ে এসেছে তারাই আবার বেশী করে বলে হিন্দু, মুসলমান আমরা ভাই ভাই। এরা মুসলমানের জন্য ভারতের সংবিধানকে অপমানিত করে। নোংরাভোটের রাজনীতির স্বার্থে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে মুসলমানের জন্য আলাদা আইন, আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা, আলাদা সংরক্ষণ, সর্বোপরি সরকারী খরচে মুসলমানদের আরবের মক্কায় হজ করতে যাওয়ার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করেছে। আর তথাকথিত হিন্দু সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে কোনও হেলদোল নেই।

৮০০-১০০০ বছরের মুসলিম শাসনে হিন্দুর জন্য কোনও সম্মানের জায়গা ছিল বলে আমার জামা নেই। হিন্দু গ্রামের মধ্যে মুসলমানের জন্য জায়গা দিচ্ছি আর বাকি হিন্দুদের অনেকটা মুরগী, ছাগলের ন্যায় আচরণ লক্ষণীয়। যেন কেউ কিছুই জানে না বা বোঝে না। এরা নিজেরা কোনও আলোচনার আয়োজন করে না, এমনকী আলোচনায় ডাকলে পাশ কাটিয়ে যায়, নানা অজুহাত দেখায়। বিশেষ করে শিক্ষিত, চাকুরীজীবী এবং বুদ্ধি জীবী শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারণ—এরাই পরিস্থিতি বুঝে আগেভাগে ঘরবাড়ি, জমি-জায়গা ওই মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে চুপি চুপি বিক্রি করে দিয়ে নিরাপদে শহরাঞ্চলে পলায়ন করছে। এই সকল হিন্দুরাও হিন্দুর মারাত্মক শত্রু। তাই এই শিক্ষিত চাকুরীজীবী এবং বুদ্ধি জীবীদেরকে হয় হিন্দুর আলোচনা সভা এবং হিন্দু আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। আগামী দিনে নিরাপদে হিন্দু ভারত গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারবে। কথায় আছে ঘর শত্রু বিভীষণ। একা বিভীষণই সেদিন ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ, রাবণের ন্যায় রথী-মহারথীদের পরাজয়ের একমাত্র কারণ ছিল। তাই আগেভাগে বিভীষণকে মারতে না পারলে লড়াইয়ের ময়দানে এরা বিশ্বাসঘাতকতা তো করবেই এবং হিন্দুর সমস্ত তথ্য এবং খবরাখবর শত্রুর কাছে দিয়ে মহৎ হবার চেষ্টা করবে।

—বিজয় দে, ডায়মণ্ডহারবার।

জন্মনিয়ন্ত্রণ ও মুসলিম অনগ্রসরতা

বীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল

খবরের কাগজ হাতে নিলেই দেখা যাবে ভারতবর্ষের একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে মুসলিম অনগ্রসরতা এবং তার জন্য যত অর্থ প্রয়োজন তা বরাদ্দ। তাই প্রায়ই একটার পর একটা প্যাকেজ ঘোষণা। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক, যেমন, ইমামের বেতন, হজে ভতুর্কী, নাম মাত্র সুদে শিক্ষা ক্ষেত্রে ঋণ, মাদ্রাসা তৈরি। মুসলিম এলাকায় প্রশাসনে মুসলিম নিয়োগ, মুসলিম এলাকার হাসপাতালে মুসলিম ডাক্তার নিয়োগ ইত্যাদি। এই অর্থ কাদের? কার ভোগের অধিকার? কে ভোগ করছে?

আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা— ভারতের সম্পদে মুসলিমদের অগ্রাধিকার। কি অদ্ভুত এবং মারাত্মক ঘোষণা। ক্ষমতার মোহে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। যিনি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা ব্যক্তি। যেখানে তাঁর পিতামহ খুন হয়েছেন।

এর বিপরীত চিত্রটা কি? হিন্দুদেরকে তীর্থে গেলে কর দিতে হবে। (মুসলিম শাসনের জিজিয়া কর।) হিন্দুরা তীর্থে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়লে বা মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ বা সাহায্য পায় না।

হিন্দুদের মন্দির এবং দেবোত্তর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে ট্রাস্টিবোর্ড গঠন করে অর্থ তছরুপ করা হচ্ছে।

কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সরকারি অনুদান গ্রহণ করলে, সেই প্রতিষ্ঠান হিন্দুধর্ম সংস্কৃতির প্রচার প্রসারে সেই অর্থ ব্যবহার করতে পারবে না। তা করলে অনুদান বন্ধ হয়ে যাবে।

অথচ মুসলিমরা তাদের ধর্ম-সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে যত খুশী অর্থ ব্যয় করতে পারবে। তার জন্য অনুদানের অভাব হবে না। এটাকে কি আপনি ধর্মনিরপেক্ষ শাসন বলবেন না মুসলিম শাসন বলবেন?

এইভাবে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার পরিস্থিতির সৃষ্টি করে চলেছেন, ভারতের অর্থ লুণ্ঠনকারী রাজনৈতিক নেতারা। আর দিবা রাত্র বিজেপি সাম্প্রদায়িক, বজরং দল সাম্প্রদায়িক, হিন্দু সংগঠন মাত্রেই সাম্প্রদায়িক, এই চিলচিৎকার করে চলেছেন। যারা হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি রক্ষার জন্য কাজ করে চলেছে, তাদের বিরুদ্ধেই এই কুৎসা। এরা ভোটের লোভে উন্মাদের মত দেশ ভাগের পূর্ববর্তী অবস্থার সৃষ্টি করে চলেছেন।

দেশ ভাগে সমস্যার সমাধান হয়েছে কি? সংরক্ষণে কি সমস্যার সমাধান হবে? কাশ্মীরে ৩৭০ ধারায় সুযোগ সুবিধা দিয়ে কোনও সমাধান হয়েছে না বিচ্ছিন্নতার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে?

টন টন বিস্ফোরক, হাজার হাজার মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র কারা আমদানি করছে, কোথায় মজুত হচ্ছে, কি উদ্দেশ্যে?

অথচ এদের জন্যই সংরক্ষণ, এদেরকেই তোষণ। অপর পক্ষে হিন্দুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ হিন্দু-কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত। পাকিস্তান থেকে বিষয় সম্পত্তি ফেলে মান ইজ্জত খুইয়ে হিন্দুস্থানে এসে পথে ঘাটে শেয়াল-কুকুরের মতো না খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মরছে। এদের কথা বলার লোক নেই। এদের প্রতি দরদ নেই কারণ এরা যে হিন্দু। আবার এরা ভারতে যাতে না আসতে পারে তার জন্য নেহেরু-নুন চুক্তি

জনমত

হয়েছে। ভারতে এলে তারা অনুপ্রবেশকারী। অথচ সমানে মুসলিম অনুপ্রবেশ ঘটছে। সে বিষয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দল মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন।

ইউপিএ সরকার মুসলিমদের হজ করানোর জন্য ব্যাকুলতার অন্ত নেই। আরও বেশী বেশী করে লোক পাঠাতে চান। হজের বরাদ্দ প্রতি বছর বাড়ে। নিজের দেশের অর্থ নীতিকে ধ্বংস করে আরবের অর্থ নীতি পুষ্ট করা। যেটা আসলে পুঁজিবাদী এবং বিশ্বের মুসলিমদের আরবের প্রতি আনুগত্য আদায়। সাম্রাজ্যবাদ।

একটা হিসাবে দেখা যাচ্ছে, প্রতি বছর প্রায় দুই লক্ষ লোক-হজে যায়। আরবের লোক সংখ্যা ৬০ লক্ষ। প্রতিটি হজযাত্রী যদি ৩ হাজার ষ্টার্লিং পাউণ্ড খরচ করে তবে নারী শিশুসহ মাথাপিছু আয় হয় এক হাজার পাউণ্ড। আরবের হজের মোট আয় ৬ শত কোটি পাউণ্ড।

মুসলিমদের অনগ্রসরতার একটা কারণ তুলে ধরছি, পাঠকগণ চিন্তা করে দেখুন। ধরুন একজন হিন্দুর ১০০ শত বিঘা জমি আছে। তাদের পরিবারের লোকসংখ্যা ৪ জন। স্বামী স্ত্রী এবং এক ছেলে, এক মেয়ে। (হাম দো হামারা দো) এদের সম্পদ ভোগীদের সংখ্যা ৪ জন। তার পরবর্তী প্রজন্মে তাদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৮ জন।

এবার একজন মুসলিমের যদি সম্পত্তির পরিমাণ হয়, ১০০ বিঘা আর তার পরিবারের লোক সংখ্যা চার বি বি সহ-১৪৯৫। আর 'এক এক বিবি যদি ৫টি করে সন্তান হয় তবে ৪৫৯২০টি। মোট সংখ্যা দাঁড়াল ২৫ জন। এই সম্পদ ভোগীদের সংখ্যা ২৫ জন। পরবর্তী প্রজন্মের সংখ্যা এই হিসাব অনুযায়ী হিসাব করে পাঠকবর্গ দেখতে পারেন এবং অনগ্রসরতার কারণ বুঝতে পারবেন।

প্রসঙ্গক্রমে আরও একটা ঘটনা দেখা যাচ্ছে, অভাবের তাড়নায়, ঋণের দায়ে আত্মহত্যার ঘটনা শুধু হিন্দুদের মধ্যে ঘটতে দেখা যাচ্ছে। মুসলিমদের মধ্যে তো অভাবের তাড়নায় বা ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করতে দেখা যায় না। কেন?

ইউ পি এ সরকার অসাংবিধানিকভাবে মুসলিম তোষণ করতে গিয়ে বার বার গালে থাপ্পড় খাচ্ছে, তবু এদের লজ্জা নেই। কেন্দ্রের সংখ্যালঘু কমিশনের আবদারে ইউ পি এ সরকার সংখ্যালঘুদের শিক্ষা বিষয়ে পৃথক সার্ভে করতে এন এস এস ও-কে বলেছিলেন। এন এস এস ও তা বাতিল করে দেন। কারণ যেহেতু সংখ্যালঘুদেরকে ও বি সি-র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেই হেতু এর কোনও গুরুত্ব নেই।

২০০৪-২০০৫ সালের প্রধান প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কর্মসংস্থানের ৬১তম যে সার্ভে করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে শহরে বসবাসকারী মুসলিমদের প্রায় অর্ধেকই স্বনিয়োজিত প্রকল্পে কর্মরত। পরিসংখ্যান দিয়ে তা দেখানো হয়েছে। শহরাঞ্চলে এই প্রকল্পে হিন্দুদের ৩৫ শতাংশ, খৃস্টানদের ২৭ শতাংশ মানুষ কর্মরত। অন্য দিকে মুসলিমদের মধ্যে কর্মরতদের সংখ্যা ৪৯ শতাংশের বেশী। এরপরও মুসলমানদের জন্য ব্যক্তিগত শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পৃথক কোনও সার্ভে করার প্রয়োজন আছে কি?

জাতীয় নদী গঙ্গার গঙ্গাযাত্রা হতে চলেছে

নবকুমার ভট্টাচার্য

ভারতের বুকে অনাদি অনন্তকাল ধরে পবিত্র জলধারার মতো বয়ে চলেছে গঙ্গা নদী। এই নদী ভারতের হৃদয়ের মতো। গঙ্গার অববাহিকার উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত। দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু একসময় বলেছিলেন, ভারতের সব নদীর মধ্যে গঙ্গাই শ্রেষ্ঠ নদী। ভারতের হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যায় এর বুকে কান পাতলে। তাই তো সভ্যতার শুরু থেকে গঙ্গানদীর কাছে ছুটে এসেছে অগণিত লক্ষ মানুষ। উৎস থেকে শুরু করে সাগর পর্যন্ত প্রবাহের মধ্যে রয়েছে ভারতের কৃষি ও সভ্যতার কাহিনী। হয়তো একারণেই স্বাধীনতার এতবছর পরে হলেও গঙ্গাকে জাতীয় নদী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। একসময়ে যে নদীর দৌলতে গড়ে উঠেছিল দেশের গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা ও সংস্কৃতি, যে নদীকে পতিতোদ্ধারিণী বলে বন্দনা করা হয়েছে—সেই গঙ্গা ভবিষ্যতে একটি নোংরা দুর্গন্ধময় বৃহৎ নর্দমায় পরিণত হতে চলেছে। এখন আমরা যদি এই নদীর স্বাস্থ্য ফেরাবার ব্যাপারে সচেতন না হই তবে গঙ্গা পরিণত হবে ইতিহাসে।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সমীক্ষক সংস্থা ডব্লু এফ-এর কনজারভেশন গ্রুপের পেশ করা এক সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে—গঙ্গাকে কেন্দ্র করে যে পরিমাণ শাখানদী অবলুপ্তির দিকে চলেছে তাতে বর্ষার ঋতু ছাড়া বছরের অন্যসময় ওই শাখানদীগুলি শুকনো থাকবে। যে দ্রুত হারে হিমালয়ের হিমবাহগুলি গলে যাচ্ছে সেই হার বজায় থাকলে ২০৩৫ সালের মধ্যেই সমগ্র হিমালয় থেকে সব হিমবাহের অস্তিত্ব মুছে যাবে।

গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে গঙ্গার ৭৫ শতাংশ জল আসে। এই হিমবাহ প্রতি বছর ১৭ মিটার দূরে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ শুকিয়ে যাচ্ছে গঙ্গোত্রী হিমবাহ। একই অবস্থা পিন্ডরি হিমবাহেরও। এই হিমবাহটি ৯.৫ মিটার শুকিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার চরিত্র মৌসুমী হয়ে গেলে সুখা মরশুমে চাষের জন্য নদীতে আর জল থাকবে না। ফলে গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলের কৃষি বিপন্ন হবে। প্রায় ৪১ কোটি মানুষের পানীয় জলের সংকট দেখা দেবে।

গঙ্গাদূষণের কারণ কি? কেবল অমৃতের ছোঁয়া পাওয়ার জন্য কুম্ভমেলা উপলক্ষে আমরা যে পরিমাণ গঙ্গাকে দূষিত করি তার মার্জনা নেই। ১৯৮৯ সালে কুম্ভমেলা উপলক্ষে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে মাসখানেকের এই মেলায় ২৫০ টন পায়খানা এবং ১০ লক্ষ টন লিটার মূত্র প্রতিদিন গঙ্গাতে মিশেছে। এবছরও হরিদ্বারে কুম্ভমেলা উপলক্ষে গঙ্গাদূষণ সম্পর্কে সরকারের প্রখর দৃষ্টি থাকলেও দূষণ সম্পূর্ণ রোধ করা যায়নি। গঙ্গা দূষণ রোধের জন্য গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান হলেও ২০০৫ সালের প্ল্যানিং কমিশনের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত শতকরা ৩৫ ভাগ কাজ বাকি রয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করলে জানা যাবে গঙ্গানদীর বিশাল দৈর্ঘের মাত্র ২৫০ কিলোমিটার পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। হুগলী নদীর জলের দূষণ মাত্রা পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সালে পলতা জলশোধন কেন্দ্র থেকে জলের এক নমুনা পরীক্ষা করা হয়। তাতে দেখা গেছে পলতার কাছে গঙ্গার জলে মোট ক্লোরিফরমের পরিমাণ সহনশীল মাত্রার ১৮৪ গুণ বেশি। দূষণের অন্যান্য কারণ তো আছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কোলিফরমের মাত্রা। এর থেকে প্রমাণ হয় গঙ্গাজল স্নানের উপযুক্ত নয়। গঙ্গা হলো জীবনধারা। তার জীবন প্রবাহকে অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং তার যথাযথ রূপায়ণ। এই পরিকল্পনার অর্থ হলো দূষণ উৎসগুলিকে বন্ধ করা অথবা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা। পশ্চিমবঙ্গে পলতা এবং উলুবেড়িয়া অঞ্চলে দূষণের অন্যতম সূচক বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমাণ্ড সংক্ষেপে বিওডির পরিমাণ যথাক্রমে ২.০৩ ও ২.৪৩ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে। ২০০৪ সালে এই তথ্য থাকলেও ২০০৯ সালে এই পরিমাণ বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ হারে।

বিপন্ন গঙ্গা

গঙ্গা অববাহিকার ওপরে অবস্থিত ওজোন স্তরের অবস্থা কি সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে, গঙ্গার জল এবং বায়ু দূষণের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে তার প্রভাব ওজোন স্তরের উপর পড়েছে। ফলে ওজোন স্তরের ঘনত্ব অনেক হ্রাস পেয়েছে। ওজোন স্তরের হ্রাসের ফলে গঙ্গা অববাহিকায় বসবাসকারী মানুষের স্বাস্থ্যের প্রচণ্ড ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

গঙ্গা নদীকে পরিশোধন করে তার পুণ্যধারাতে স্নাত হয়ে আমাদের যাবতীয় কলুষ ধুয়ে ফেলার জন্য কেবল কিছু অর্থবরাদ্দ আর বছরে একবার পদযাত্রা করলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না। গঙ্গানদী সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। নদীতে কোনরকম আবর্জনা যাতে ফেলা না হয় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। নদীতে শ্যাম্পু সাবান ব্যবহার না করা, কাপড় জামা না কাচা, নদীতে মৃত গরু মহিষ না ফেলা আমাদের কর্তব্য। এর সঙ্গে সঙ্গে আগামীদিনে গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জনের ব্যাপারেও আমাদের বাস্তবসম্মত চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। আগামীদিনে গঙ্গার দূষণমুক্ত নির্মল জল পান করার যোগ্য অধিকার যেন আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্জন করতে পারি।

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

ডঃ প্রণব রায়

শ্যামসুন্দরের রাসমঞ্চ , খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগণা।

।।১।।

বাংলার মন্দির বলতে প্রধানত এখানে পশ্চিমবাংলার মন্দিরগুলোর কথাই বলা হচ্ছে। আবার, হাজার হাজার যেসব মন্দির পশ্চিমবাংলার জেলাগুলোতে আজও বিদ্যমান, সেগুলির প্রায় সবই তৈরি হয়েছিল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খৃস্টাব্দ) পরবর্তীকালে অর্থাৎ পাঠান যুগ থেকে মোগল আমলের শেষ পর্যায় পর্যন্ত, এমনকী, ইংরেজ আমলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। এই সময়সীমা ধরা যায়, খৃস্টীয় সনের—ষোল শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত। বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্তও অনেক মন্দির তৈরি হয়। আজও সেই ধারা কিছুটা বর্তমান, তা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। মুসলমান বিজয়ের পর থেকে (১২০৩ খৃঃ) আমরা মধ্যযুগের শুরু মনে করি। তার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ পাল-সেন শাসন পর্যন্ত পুরানো বাংলায় উচ্চ চূড়াযুক্ত ইঁট ও পাথরের বহু মন্দির তৈরি হয়েছিল, যেগুলি স্থাপত্য ও কারুকার্যের ক্ষেত্রে খুবই দর্শনীয় ও উন্নতমানের ছিল। কয়েকটি ছাড়া সেগুলি প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গেছে। এরপর তুর্কী ও পাঠান শাসনকালে মন্দির তেমন তৈরি হয়নি। অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির সেসময় ভেঙে ফেলা হয় বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেইসব পুরানো মন্দির কোনও কোনও জেলায় আজও দেখতে পাওয়া যায়, যেমন বহুলাড়া ও সোনাতপল (বাঁকুড়া), পুরুলিয়ার কয়েকটি স্থানে যেমন দেউলঘাট, পাড়া ইত্যাদি, সাতদেউলিয়া (বর্ধমান), জটা (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা), দক্ষিণ ও উত্তর দিনাজপুরের কয়েকটি স্থানে (যদিও সেগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত) এবং জলপাইগুড়ির জটিলেশ্বর এবং জল্পেশ্বর (এদের উপরিভাগ নবীকৃত)।

পনের শতকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরবর্তী এক শতকের মধ্যে মন্দিরের যে বন্যা সারা বাংলাকে প্লাবিত করেছিল, তারই ফলশ্রুতিরূপে বাংলায় অজস্র মন্দির তৈরি হয়। এগুলোর আকার ও আয়তন প্রাচীন বাংলার (মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত) মন্দিরের মতো উচ্চ 'শিখর'-রীতির ছিল না, তার বদলে ছোট ছোট 'চালা' (গ্রামবাংলার খোড়ো 'চালার আদলে), 'চাঁদনি' বা দালানের ওপর ছোট ছোট 'শিখর' বসিয়ে 'রত্ন' মন্দির, ছোট ছোট 'দেউল' মন্দির তৈরি হতে থাকে, যেগুলি এখন হামেশাই গ্রাম-গ্রামান্তরে ও শহরে দেখতে পাওয়া যায়। আর এক শ্রেণীর মন্দির এযুগে নিমিত হতে থাকল, তা হলো 'বাংলার'-রীতি অর্থাৎ 'একচালা' বা একটি ঢালু চালযুক্ত আয়তাকার মন্দির, দোচালা বা সামনে-পেছনে ঢালু চালযুক্ত মন্দির এবং 'জোড়বাংলা' বা দুটি দোচালাকে সামনে-পেছনে যুক্ত করে এক শ্রেণীর আকর্ষণীয় মন্দির নির্মিত হতে লাগল। 'একচালা'কে 'একবাংলা', 'দোচালা'ও 'বাংলা'। কিন্তু 'জোড়বাংলা'র একটা আলাদা সৌন্দর্য ছিল, যা শ্রীচৈতন্যপরবর্তী মধ্যযুগীয় মন্দিরস্থাপত্য শৈলীতে পরিস্ফুটিত হয়েছিল।

বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) বিখ্যাত কেষ্টরায়ের 'জোড়বাংলা' মন্দিরটি (১৬৫৫ খৃঃ) এই রীতির একটি শ্রেষ্ঠ মন্দির। ইঁটের এই মন্দিরের দেওয়ালের প্রতিটি স্থানে 'টেরাকোটা'-মূর্তি যুক্ত আছে। পশ্চিমবাংলার চেয়ে পূর্ব বাংলা বা 'বাংলাদেশে' এই রীতির 'বাংলা' মন্দির অনেক তৈরি হয়।

এগুলিতে সাধারণ দরিদ্র বাঙালি খোড়ো 'চালা' ঘরের অনুকরণ করা হয়েছে। গৌড়ের (মালদা) কোনও কোনও মসজিদের ওপরও এই দোচালা বা 'চারচালা'র সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয়, এই 'চালা'-শৈলীর জনপ্রিয়তা কতখানি ছিল। শ্রীচৈন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের আগেও 'চালা' শৈলীর মন্দির নির্মাণে মন্দির প্রতিষ্ঠাতা ও স্থপতিদের আগ্রহ ছিল। তার প্রমাণ আছে।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, শেষ মধ্যযুগে ও প্রাচীন বাংলায় অজস্র মন্দির নির্মাণ শুধুমাত্র ধর্মীয় ভাবাবেগকে উজ্জীবিত করার জন্যে হয়নি। ভারত তথা বাংলার বিভিন্ন ধর্মের দেবদেবীদের পূজা উপাসনার জন্য তো বটেই, কিন্তু ওইসব মন্দিরে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার যে অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল, তা আজও আমাদের কাছে প্রাচীন শিল্পকলার গৌরবচ্ছটাকে তুলে ধরে। কিন্তু এটা খুবই দুঃখের, ওইসব শিল্পকলার নিদর্শনকে আমরা ঠিকভাবে রক্ষা করতে পারিনি। বহু মন্দির এর মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে বা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে অথবা বিদেশীদের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেছে। যেগুলি আজও কোনওক্রমে তাঁদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, সেগুলিও উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে এবং অবহেলা অনাদরে ধ্বংসপ্রায়। বিশেষ করে বাংলার মন্দিরগুলির শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করে বিদেশী শিল্পরসিকেরা অত্যন্ত অভিভূত হয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ গ্রামে প্রান্তরে ঘুরে এইসব মন্দিরের তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করেছেন। 'বাংলার মন্দিরে মন্দিরে'—এই রচনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার ওইসব মন্দিরের স্থাপত্য ভাস্কর্যকলা তথা দেবদেবীর উপাসনা নিয়ে কিছুটা পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। একথা সত্য, মসজিদও তৈরি হয়েছিল বেশ কিছু দুই বাংলায়। কিন্তু মন্দিরের তুলনায় তার সংখ্যা অনেক কম। তাছাড়া স্থাপত্য-বৈচিত্র্য ও দেওয়ালের গায়ে বসানো যে অন্তহীন 'টেরাকোটা মূর্তি ও পাথরের ফলকে খোদিত ভাস্কর্যমূর্তি এবং দেবদেবী-লীলাগাথা ছাড়া মানবজীবনের যে আকর্ষণীয় ছবি ও পশুপাখির দৃশ্য মূর্ত হয়ে উঠেছে, তা মসজিদ বা অন্য কোনও ধর্মীয় স্থাপত্যে একেবারেই নেই। ইঁটের বা পাথরের মসজিদগাত্রে শুধুমাত্র ফুল ও ফুলকারি নকশা ছাড়া মূর্তিমান কোনও চিত্র-ফলক পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলার অসংখ্য মন্দিরগাত্রে, বিশেষ করে, ইঁটের মন্দিরে 'টেরাকোটা' অলংকরণ যেন প্রবাদে পরিণত হয়েছে। এগুলি আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলার অমূল্য নিদর্শন। সেই মন্দিরগুলি অবহেলার যোগ্য তো নয়ই, কিন্তু বিশেষভাবে, গবেষক ও পর্যটকের লক্ষ্য করার যোগ্য।

পল্লীবাংলার আনাচে-কানাচে এবং শহরের নানা স্থানে সুন্দর সুন্দর অনেক মন্দির আমরা লক্ষ্য করেছি। হুগলি নদীর উভয়তীরে একসময় মন্দির প্রতিষ্ঠা করা একটা প্রথায় পরিণত হয়েছিল। জমিদার ও বণিকসম্প্রদায় একসময় অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা এইভাবে হয়েছিল। তাঁর এক কন্যা ব্যারাকপুরের তালপুকুরে ওই ধরনের 'নবরত্ন'-রীতির অন্নপূর্ণা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তারও আগে বরানগরে জয় মিত্রের কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কর্মযোগ

।। নীল উপাধ্যায়।।

যাঁরা বিভিন্ন কন্সালটেন্সি বা প্লেসমেন্ট এজেন্সিতে নাম লিখিয়েও মনের মতো চাকরি পাচ্ছেন না, তাঁরা চাকরি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের সাহায্য নিতে পারেন ঃ

www. fresherblog. com

বিপিও, কলসেন্টার, আইটি, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি নানা ধরনের চাকরির সন্ধান রয়েছে এই সাইটে। শুধু সরকারি চাকরি নয়, বেসরকারি চাকরিও পাওয়া যাবে। সরকারি চাকরির জন্যে ক্লিক করতে হবে Govt. jobs অপশনটি। এতে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি চাকরির সন্ধান রয়েছে।

http :// freshjobopenings com

সদ্য পাশ করেছেন বা যাদের কাজের অভিজ্ঞতা আছে, তারা এই সাইটে চাকরির সন্ধান করতে পারেন। এই সাইটে সফটওয়্যার সংক্রান্ত চাকরির খোঁজখবরই বেশি। সফটওয়্যার ছাড়া এই সাইটে খোঁজ করা যেতে পারে ব্যাঙ্কিং, অটোমোবাইল, বিপিও, কেমিক্যাল, কনস্ট্রাকশন, ডেটাবেস ফাইনান্স, গ্রাফিক্স্ ডিজাইনার, হোটেল, এইচ আর, সেলস ও মার্কেটিং, ফার্মাসিউটিক্যাল, রিটেল, শিপিং, এনার্জি ইত্যাদি। সাইটে ই-মেল আইডি দিয়ে রেজিস্টার করিয়ে নিলে বিভিন্ন চাকরির সন্ধান এসে পৌঁছবে নিজস্ব মেল অ্যাকাউন্টে।

www. tatentpod. asia

ভারতের বিভিন্ন শহরে নানা ধরনের চাকরির খোঁজ মিলবে এই সাইটে। নানা ধরনের জব ক্যাটিগরির মধ্যে রয়েছে সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার, টেলিকম, সেলস, মার্কেটিং ও কমিউনিকেশন, কলসেন্টার, বিপিও, কাস্টমার কেয়ার, এইচ আর, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ফাইনান্স ও অ্যাকাউন্টস, হোটেল, ট্র্যাভেল, ব্যাঙ্কিং, সাপ্লাই চেন, ফার্মাসিউটিক্যাল, লিগাল, এক্সপোর্ট ও ইম্পোর্ট, এন্টারটেনমেন্ট, ইসসিওরেন্স ইত্যাদি। 'জবস বাই লোকেশন' সেকশনে রয়েছে বিভিন্ন শহর অনুযায়ী চাকরির সন্ধান।

www. indianjobtalks. com

এই সাইটে অসংখ্য সরকারি বেসরকারি চাকরির খবর রয়েছে। 'Govt. jobs in Indi' সেকশনে যেসব সরকারি চাকরির সন্ধান রয়েছে সেগুলি হলো ইউ পি এস সি, স্টাফ সিলেকশন, আইবি, পুলিশ, ডিফেন্স ইত্যাদি। 'Bank jobs in India' সেকশনে পাওয়া যাবে শুধু ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত চাকরির খোঁজ খবর। আর রেলের চাকরির সন্ধান পেতে 'RRB board vacancies' অপশনে ক্লিক করতে হবে। সরকারি চাকরির সন্ধান ছাড়া আর যেসব ক্যাটিগরির চাকরির খবর আছে সেগুলি হলো ফাইন্যান্স, অ্যাকাউন্টস, ট্যাক্স, ব্যাঙ্কিং, সেল্‌স ও মার্কেটিং, ফ্রন্ট অফিস, সেক্রেটারি, হোটেল, এয়ারলাইনস, এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট, লিগ্যাল, এডুকেশন, প্যাকেজিং ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র ঃ ওয়েবসাইটে চাকরি—আবিররঞ্জন আতর্থী

।। চিত্রকথা ।। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।। ১৪

শ্রীচৈতন্যদেব চব্বিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরীতে চলে আসেন। পুরীতে গম্ভীরা মন্দিরে তিনি দিবারাত্রি কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকতেন।

হঠাৎ হঠাৎ গম্ভীরার ভিতর থেকে 'হা-কৃষ্ণ, হা-কৃষ্ণ' বলে ছুটে বেরিয়ে যেতেন। কখনও বা সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

একদিন মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথদেবের বিগ্রহকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। সকলকে হতবাক করে দিয়ে জগন্নাথদেবের বিগ্রহের মধ্যে তিনি বিলীন হয়ে যান।

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর-এর সৌজন্যে। (সমাপ্ত)

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর।।

হারানিধি ২২১ বছর পর

১৭৮৯ সাল। ফরাসি বিপ্লবের উত্তাল বছর। নিউইয়র্ক লাইব্রেরি থেকে 'দ্য ল অব নেশনস' বইটি পড়তে নিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন। ফেরৎ দিতে ভুলে যান। সম্প্রতি, ২২১ বছর পর বইটির কপি ফেরৎ দিলেন তাঁর উত্তরসূরীরা। লেট ফি দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ডলার।

হিটলারের ক্রিকেট

দূর! এতো মেয়েদের খেলা! সাফ জানিয়েছিলেন অ্যাডলফ হিটলার। ১৯২৩-এ ক্রিকেটে ঝোঁক হলো তাঁর। অতএব প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বন্দি এগারোজন বৃটিশ সৈনিককে নিয়ে তৈরি হলো 'ইংল্যান্ড টিম'। হিটলারের নির্দেশে ভূমিষ্ঠ হলো জার্মান দলও। কিন্তু তারা পারবে কেন? সুতরাং ভাবী ফুয়েরার হুকুম, এজিনিস বৃটিশদের হাতে চলতে পারে, জার্মানির জন্য চাই আরও বড়, আরও শক্ত বল, আর— নো প্যাড, ওটা মোটেই পুরুষোচিত নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফল উল্টো হলে ক্রিকেটের স্কোরবোর্ডে রানের হিসেবের সঙ্গে হতাহতের হিসেবও দিতে হোত।

এক গাছে ১৯-জাতের আম

আম্রপালি, মল্লিকা, সুবর্ণভোগ, বারোমাসি, ল্যাংড়া, ফজলি, মোহনভোগ —ইত্যাকার ১৯-জাতের আমের সমাবেশ ঘটিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার তোতা মিঞা। কলম পদ্ধতিতে একটি আম গাছেই তিনি একাধিক জাতের আম ফলাচ্ছেন। তোতা মিঞার সাফল্য এলাকাবাসীকে নানা জাতের আম চাষে উদ্বুদ্ধ করছে।

৯৯ বছরের ভুল

অস্ট্রেলিয়ার পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক স্টিফেন হিউজ অক্সফোর্ড অভিধানের ৯৯ বছরের একটি ভুল সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছেন। অভিধানে 'সাইফন' নামে একটি বাঁকা নলের সংজ্ঞায় এমন কিছু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা সম্পূর্ণ ভুল। হিউজ জানান, সাইফন নিয়ে একটি ফিচার লিখতে গিয়ে ভুলটি তাঁর নজরে আসে। সাইফন এক ধরনের বাঁকা নল যার মাধ্যমে এক আধার থেকে অন্য আধারে তরল পদার্থ স্থানান্তরিত করা হয়। যে-শক্তি বলে এই কাজটি সাধিত হয়, অভিধানে তাকে বায়ুচাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা আসলে মাধ্যাকর্ষণের ফলে সংগঠিত হয়। ১৯১১ সালে যাঁরা 'সাইফন'-এর সংজ্ঞা লিখেছিলেন, তাঁরা কেউই বিজ্ঞানী ছিলেন না।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

শিক্ষক ঃ বিড়াল আর দুধের মধ্যে মিল কোথায় বল্।

ছাত্র ঃ দু'টিরই ছানা হয় স্যার।

*　　*　　*

সাহিত্যিকের বাড়ির কাজের লোক একদিন জিজ্ঞেস করে, 'বাবু, রাত জেগে এত লেখেন, আপনার কষ্ট হয় না?

সাহিত্যিক ঃ আমি বই লিখি।

চাকর ঃ ওমা! এত কষ্ট না করে বাজার থেকে কিনে আনলেই তো পারেন। বাজারে সস্তায় বইও পাওয়া যায়।

*　　*　　*

বাবা ঃ ডাক্তারিতে ভর্তি হয়েছিস। কিসে স্পেশালিস্ট হবার ইচ্ছে—হার্ট স্পেশালিস্ট না নিওরোলজিস্ট?

ছেলে ঃ আমি ডেন্টিস্ট হব।

বাবা ঃ সে কি রে?

ছেলে ঃ হ্যাঁ বাবা, হার্ট তো থাকে মাত্র একটি। আর দাঁত থাকে বত্রিশটি—রোজগারও বেশি।

*　　*　　*

প্রথম বন্ধু ঃ নতুন বাড়িভাড়া নিয়েছিস। বাড়িওলা কেমন লোক রে?

দ্বিতীয় বন্ধু ঃ এমনিতে ভালই, তবে ভাড়ার জন্যে বড্ড তাগাদা দেয়।

*　　*　　*

স্বামী ঃ মাথাটা বড্ড ধরেছে, একটু টিপে দেবে!

স্ত্রী ঃ গলা ব্যথা করলে বলো।

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। রবীন্দ্রনাথ বাংলার কোন্ প্রখ্যাত কবিকে 'ভোরের পাখি' আখ্যা দিয়েছিলেন —বিহারীলাল চক্রবর্তী/সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত/ কুমুদরঞ্জন মল্লিক?

২। 'হারমোনিকা ব্যাগ' বল্‌তে গুপ্তচরেরা কী বোঝেন?

৩। ভারতের একমাত্র ভাসমান জাতীয় উদ্যান কোথায়? এর নাম কী?

৪। শূন্য সংখ্যাটি কে আবিষ্কার করেছিলেন?

৫। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন কে?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। বিহারীলাল চক্রবর্তীকে

২। টেলিফোনে আড়িপাতার যন্ত্রকে

৩। মণিপুরে, কেইবুল লামজাও

৪। ভারতীয় বিজ্ঞানী আর্যভট্ট

৫। নেলসন ম্যান্ডেলা (১৯৯৪)

অরণ্যের দিনরাত্রি

অভিরূপ ঠাকুর॥ কেমন আছে অরণ্য? কেমন আছে সেখানকার বাসিন্দারা? শালপ্রাংশু গহন অরণ্যানীকে নিশ্চিন্ত আশ্রয় করে যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়ে দিয়েছেন। আজ জানতে ইচ্ছে করে কেমন আছে তারা? 'সিভিলাইজেশনে'র গরিমা কি তাদের আদৌ স্বস্তিতে রেখেছে? উত্তরটা বোধহয় নেতিবাচক-ই হবে। আসলে ইতিবাচক কিছু খোঁজার চেষ্টা আমরা বহুকাল ত্যাগ করেছি। কারণ অরণ্যের বাসিন্দাদের দু'ভাগে ভাগ করে তাদের দু'রকমভাবে 'কাজে লাগানো'র চেষ্টা করা হয়েছে এতদিন। বলা বাহুল্য, যারা এই কাজে লাগিয়েছেন তারাই প্রত্যক্ষভাবে শহুরে সভ্যতা (যার নামই বোধ হয় সিভিলাইজেশান) গড়ে তোলার জন্য দায়ী। ভাল-মন্দতে মেশানো হতে পারে শহুরে সভ্যতা; কিন্তু এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে জনজাতি আর জঙ্গলের পশু-পাখীদের সঙ্গে যতরকম গর্হিত ব্যবহার করা যায়, তা হয়েছে 'সিভিলাইজেশন' গড়ে তোলার নামে। একথা ভুললে চলবে না যে জনজাতিদের সঙ্গে অরণ্যের নাড়ির বন্ধন, এর বিচ্ছেদ অসম্ভব। অথচ জনজাতিদের দীর্ঘদিন ধরে অবহেলা করে তাদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করে, অন্ন বস্ত্র-বাসস্থানের মানবিক মুখ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে সর্বগ্রাসী সভ্যতা তাদের গিলে খেয়েছে। মাওবাদীদের এই বাড়-বাড়ন্ত যার অন্যতম একটি সম্ভাব্য কারণ।

দ্বিতীয়ত, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্যোগ সরকারি তরফ থেকে নেওয়া হলেও, সেই 'উদ্যোগ' কাগজে-কলমেই থেকে গেছে। কার্যে রূপান্তরিত হয়নি। যে কারণে আজ বিলুপ্ত বা বিপন্ন কয়েকটি শ্রেণীর পশু-পাখি। তলানিতে এসে ঠেকেছে জাতীয় পশু বাঘের সংখ্যাও। বর্তমানে ভারতবর্ষের বনাঞ্চল সংক্রান্ত কিছু তথ্য-পরিসংখ্যানের দিকে চোখ-বোলালেই বাস্তব অবস্থাটা স্পষ্ট হবে।

● ভারতবর্ষের ৬০ শতাংশ বনাঞ্চল জুড়ে রয়েছে ১৮৭টি জনজাতি জেলা। যেটা দেশের ভৌগোলিক এলাকার প্রায় ৩৩ শতাংশ।

● কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ৬২.৯ শতাংশ জনজাতি হয় ভূমিহীন নয়তো ১ হেক্টরের কম জমির মালিক।

● যখন যে সরকারই আসুক না কেন তারা জনজাতিদের জমি নিয়ে তাতে সংরক্ষিত ও অভয়ারণ্য গড়ে তুলেছে। জমি হস্তান্তর করতে বাধ্য করেছে জনজাতিদের। এর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতেই পারে। সরকারি রেকর্ড বলছে অন্ধ্রপ্রদেশে ৭৭ হাজার ৬৬১ একর জমি নিয়ে যে 'সংরক্ষিত বনাঞ্চল' (রিজার্ভ ফরেস্ট) গড়ে উঠেছে, ১৯৮০ সালের ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী কিন্তু সেখানে জনজাতিদের চাষ করতে দেবার কথা।

● ওড়িশার অবস্থাটা আরও মারাত্মক, ১৯৭০-এ সেখানে যখন উদ্বৃত্ত জমির সুষ্ঠু-সমাধান (রেভিনিউ ল্যান্ড সেটেলমেন্ট) সম্পন্ন হচ্ছিল তখন সেখানকার পাহাড়ি জমি-সংক্রান্ত কোনওরকম সমীক্ষা হয়নি। সমীক্ষা না হওয়ার অপদার্থতা ঢাকতে ওইসব পার্বত্য এলাকার জমিসহ সমীক্ষা না হওয়া গ্রামের বিভিন্ন চাষযোগ্য জমিকেও সরকার 'খাস-জমি' (অর্থাৎ তাদের নিজেদের জমি) বলে দাবি করে। এমনকী জনজাতিদের কিছু চাষযোগ্য জমিকে পরিত্যক্ত বলে দিব্যি চালিয়ে দেয়। ওড়িশার প্রায় ৭০ লক্ষ জনজাতি মানুষ বসবাস করেন। প্রকৃতপক্ষে ওড়িশার 'সংরক্ষিত বনাঞ্চলে'র ৪৪ শতাংশই জনজাতিদের চাষ-জমি নিয়ে গঠিত। যে জমির সঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষদের যুগ-যুগান্তের সম্পর্ক। এ সংক্রান্ত একটা মজার তথ্য হলো, ওড়িশার সমগ্র বনাঞ্চলের প্রায় ৫৫ শতাংশই রাজ্যের শুল্ক দপ্তরের অধীনে রয়েছে। কিন্তু শুল্ক-ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিলি-বণ্টন নিয়ে হওয়া একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ওই পরিমাণ জমি সরকারি খাতায় আদৌ 'বনাঞ্চল' হিসেবে হিসেবে নথিভুক্ত নেই।

● ছ'য়ের দশক থেকে নয়ের দশক— এই তিনটি দশকের ব্যবধানে আমরা বহু বনাঞ্চল হারিয়েছি। এটা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে ১৯৬১ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে বনাঞ্চলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেইসময় প্রায় ৪১ মিলিয়ন হেক্টর থেকে ২৬ মিলিয়ন বেড়ে ৬৭ মিলিয়ন হেক্টরে পৌঁছে গিয়েছিল সামগ্রিক বনাঞ্চলের পরিমাণ। কিন্তু এই সময়েই সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পরিমাণ ২৬ মিলিয়ন হেক্টর থেকে বেড়ে ৪৬ মিলিয়ন হেক্টর পৌঁছে গেছিল। এছাড়া অভয়ারণ্য ইত্যাদি-তো রয়েছেই। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় নীতিই হলো—ঠেকায় পড়ে বিপন্ন বা বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির জন্য সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করা। আর বনাঞ্চলের সঙ্গে যাদের জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক সেই জনজাতিদের সেখান থেকে উচ্ছেদের বন্দোবস্ত করা। তাই জনজাতি সম্প্রদায়ের বংশ বৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু বাপ-দাদার ভিটে ছাড়া হয়েছে তারা।

● একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ৩০টি ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্পের অন্তর্গত বনাঞ্চলে ১৫০০টি গ্রামে ৬৫ হাজার পরিবারের ৩ লক্ষ ২৫ হাজার মানুষ বসবাস করেন। ১৯৮৯ সালে একটি অনুরূপ প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছিল প্রায় ৬০০টি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অন্তর্গত এলাকার ত্রিশ লক্ষ জনজাতি মানুষ বসবাস করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই মানুষগুলোকে বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারটুকুও দেয় না বন-দফতর।

● এ নিয়ে ইউ পি এ সরকার তাদের নিজের তৈরি আইন নিজেই ভেঙেছে। তাদের এই 'ভাঙা'র খেলার স্থানটি বিজেপি শাসিত দু'টি রাজ্য—মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়। ২০০৬-এর ডিসেম্বর ইউ পি এ সরকারের আমলে পাশ হয়েছিল বন সংরক্ষণ আইন। কিন্তু এই আইন অমান্য করে সেখানকার বনাঞ্চলের ৪৬ হাজার ২৩৫ হেক্টর জমিতে কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়িত হলো। বৃহত্তর মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের থেকেও যার আয়তন বেশি!

উপরের খতিয়ানগুলো প্রমাণ করে জনজাতিদের প্রতি দীর্ঘদিন ধরে সরকারি তরফে কী নিদারুণ বঞ্চনা হয়েছে। এবারে দেখা যাক বনাঞ্চল সাফ করে নগর-সভ্যতা কিভাবে সেটাকে গ্রাস করেছে এবং তার ফলে জনজাতি মানুষের আরও কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

● ১৯৫০-১৯৯১—এই চার দশকে খনি-অঞ্চল গড়ে ওঠার জন্য ২৬ লক্ষ মানুষকে বাস্তুচ্যুত হতে হয়েছে। সমীক্ষা বলছে—সবকটি উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনায় গৃহহারা মানুষদের হাজারো আশ্বাস সত্ত্বেও পুনর্বাসন জোটে মাত্র পঁচিশ শতাংশের। এই গৃহহীনদের মধ্যে ৫২ শতাংশই হলো জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ।

● এমন দেখা গেছে খনি তৈরির জন্য একটা মানুষকে হয়তো তিন-চারবার গৃহহীন হতে হয়েছে। জনজাতিরা অরণ্যের সন্তান। সেই অরণ্যের একাংশকে অভয়ারণ্য বানালে, আর বাদবাকি অংশকে নগরায়ণের কাজে ব্যবহৃত করলে জনজাতিরা যাবে কোথায়? ভুললে চলবে না, দেশের জি ডি পি (অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হার)-এর এক শতাংশ বৃদ্ধিতেও তাদের অবদান রয়েছে।

● সবচেয়ে উদ্বেগজনক তথ্য হলো, বনাঞ্চল ধ্বংস করে দেশে খনি তৈরির পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। ১৯৮০ থেকে '৯৭ পর্যন্ত যেখানে ২১৬টি খনি-অঞ্চল গড়ে উঠেছিল সেখানে তার পরবর্তী ১৯৯৮ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত মাত্র সাত বছরে সমসংখ্যক খনি অঞ্চল গড়ে উঠেছে।

● আগামী বিশ বছরে আরও অনেক খনি অঞ্চল গড়ে উঠবে। কারণ আকরিক বা কাঁচা মালের জন্য খনি সত্যিই খুব দরকার। দরকার নেই শুধু বনাঞ্চলের। অভয়ারণ্যটুকু কোনও ক্রমে বিশ্বের কাছে বাহবা কুড়বো। আর ইট-কাঠ-পাথরের খাঁজে চাপা পড়তে পড়তে শুনব কোনও জনজাতি রমণী বা মরদের দীর্ঘশ্বাস। গত ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন ঘটা করে হয়ে গেল। কিন্তু ভেতর ভেতর একটা কান্না গুমরোচ্ছেই—জনজাতিদের মেরে বন বাঁচাতে পারবো তো? বন না বাঁচলে পরিবেশটা কি বাঁচবে?

রঙ্গম

পটলবাবু ফিল্মস্টার— সত্যজিত রায়ের কাহিনী নিয়ে নাটক

বিকাশ ভট্টাচার্য।। বিশ্ববরেণ্য সত্যজিৎ রায়কে বিশ্ববাসী এমন কি সাধারণ ভারতবাসী চেনে তাঁর চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। চলচ্চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মান অস্কারও তিনি পেয়েছেন। কিন্তু সিনেমা তৈরি ছাড়াও তাঁর সৃজনশীলতা আঁকাজোকা, গল্প-উপন্যাস লেখা বা সঙ্গীত সৃষ্টি—এমন বহুবিধ মননশীল কর্মকাণ্ডে ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের পর এমন বহুমুখী প্রতিভা আর কারও মধ্যে আমরা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ফেলুদা, প্রফেসর শঙ্কুকে নিয়ে তাঁর গল্প বা অন্য গল্প পড়ে মুগ্ধ হয়নি এমন বাঙ্গালী নেই বললেই চলে। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির জগৎ বিরাট। সর্বপ্রথমে যা গল্প, সবশেষেও তা গল্প। কোনও জটিল তত্ত্ব নয়, ছোট গল্পে তিনি খুঁজে নিয়েছেন মুক্তি ও বিস্ময়। বিদগ্ধ সমালোচকদের ভাষায়, 'আমাদের খন্ডিত অস্তিত্বের সমস্যাসঙ্কুল জগৎটা সেখানে মাথা চাড়া দেয় না। তার বদলে পাই মহাকাশের সংকেত, অতল সমুদ্রের ডাক, মরু বা মেরুর ইশারা অথবা মানুষের, একান্তই ছাপোষা সাধারণ মানুষের অশেষত্বের ঠিকানা। প্রযুক্তি পারঙ্গম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যে-মানুষের গল্প তিনি শোনান সে-মানুষ গাণিতিক সিদ্ধি র জগতে গণিতের অতীত মানুষ।'

জগৎ ও জীবনকে সত্যজিৎ এমনই শিল্পী স্বভাবে দেখেছেন আগাগোড়া। ফলে তাঁর গল্পের কিশোরপাঠ্য ও বয়স্কপাঠ্যের বিভাজনরেখা মুছে গেছে অনায়াসে। সব বয়সী পাঠককে তাঁর গল্পের জগতে তিনি টেনে আনতে পেরেছেন। আর সেইজন্যই বোধহয় ইদানীং তাঁর গল্প নিয়ে একের পর এক নাটক তৈরি হচ্ছে। এবং সেইসব নাটক ছোট-বড়ো সব দর্শককে মোহিত করছে। এর মধ্যে রমাপ্রসাদ বণিকের 'অনুকূল', সব্যসাচী চক্রবর্তী নির্দেশিত 'অপ্সরা থিয়েটারের মামলা', অতি সম্প্রতি মঞ্চ স্থ সীমা মুখোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় 'ব্রজবুড়োর সবুজ বাক্স' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পটলবাবুকে নিয়ে

তবে এসবের মধ্যে উপভোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার নিরীখে সবকটিকে ছাপিয়ে গেছে ছাপোষা এক মধ্যবিত্ত মানুষ পটলবাবুকে নিয়ে তার গল্প অবলম্বনে 'পূর্ব-পশ্চি ম' নাট্যদলের প্রযোজনা 'পটলবাবু ফিল্মষ্টার'। একটা অতি ছোট গল্পকে অত্যন্ত মুন্সীয়ানার সঙ্গে নাট্যরূপ দিয়েছেন রমাপ্রসাদ বণিক। নির্দেশনাও তাঁর।

অভিনয় পাগল পটলবাবু

এক অনুসন্ধানী শিল্পীমনকে সত্যজিৎ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর এই গল্পে। পঞ্চ াশোর্ধ শ্রী শীতলকান্ত রায় ওরফে পটলবাবুর অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ চিরদিনের। মঞ্চ সফল বহু নাটকের আগাগোড়া তার কণ্ঠস্থ। পাড়া-বেপাড়ায় যেখানেই নাটক, যেখানেই রিহার্সাল সেখানেই হাজির পটল। অভিনয়ের প্রতি তার এই আকর্ষণ আর তাকে ঘিরে এক সামাজিক টানাপোড়েন—দুঃখ, যন্ত্রণা, সংগ্রামের অভিঘাত দেখতে পাই এই নাটকে। শেষপর্যন্ত একটি সিরিয়ালে পটলের ডাক আসে। উৎসাহিত পটল সেজেগুজে সময়মতো হাজির হয় স্যুটিং-এ। সকাল থেকে একের পর এক শট নেওয়া হচ্ছে নায়কের। কিন্তু পটলের আর ডাক আসে না। বিরক্ত পটল যখন চলে যেতে চায় তখন ডিরেক্টর তাকে ডাকে এবং শট দিতে বলে। সংলাপের কাগজ নেই, রিহার্সাল নেই—একেবারে টেক? ডিরেক্টর বলেন, তার সঙ্গে রাস্তায় অন্যমনস্ক নায়কের ধাক্কা লাগবে। আর তাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে হবে একটিমাত্র শব্দ—'আঃ'। প্রথমে পটল হতাশ হয়ে চলে যেতে চায়। হঠাৎ তার মনে হয় এই একটি শব্দই বা কোন্ প্রয়োজনে নির্গত হবে? কোন অনুভবে? এটাই হয়ে ওঠে পটলবাবুর অনুসন্ধান। তাঁর উচ্চারণ 'আঃ' ডিরেক্টরকে খুশী করে। পটলও খুশী হয়ে বাড়ি ফেরে।

সত্যজিৎ-এর দর্শন

এক অনুসন্ধানী শিল্পীমনকে তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এই গল্পে। সামান্য কাজ নিখুঁতভাবে করবার আগ্রহ আর পরিশ্রম—মানুষের কর্তব্যের এই তো সংজ্ঞা। পটলবাবুর অভিনয়-প্রেমকে জীবনদর্শনের নিরীখে বাঁধতে চেয়েছেন তিনি। এই অনুভব থেকেই নাট্যকার-নির্দেশক রমাপ্রসাদ বণিক একটি অণুগল্পের বীজ থেকে পূর্ণদৈর্ঘ্যের নাটকে অবলীলায় তার বিস্তার ঘটিয়েছেন। বহু চরিত্র এসেছে। নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি হয়েছে। এক অসাধ্যসাধন করেছেন নির্দেশক। গল্পটি পড়লে এবং নাটকটি দেখলে তা বোঝা যায়।

পার্থসারথী দেব

পরিশেষে যার কথা না লিখলে আমার এই লেখা অসমাপ্ত থেকে যাবে—তিনি পটলবাবুর ভূমিকাভিনেতা পার্থসারথী দেব। অপূর্ব অভিনয়ে তিনি পটলবাবুর চরিত্রে প্রাণ সঞ্চ ার করেছেন। আগাগোড়া মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয় তাঁর অভিনয়। বিভিন্ন অনুভূতি ও আবেগ থেকে 'আঃ' শব্দের উচ্চারণ তিনি অসংখ্যবার করেছেন সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা ভাবে। সেইসঙ্গে পটলবাবুর শাশুড়ি নিভাননীর চরিত্রে ছন্দা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় ও গান মন কাড়ে। পটলের অভিনয়ের অনুরাগী নিশিকান্তের চরিত্রে সৌমিত্র মিত্রকে কোথাও মনে হয়নি অভিনয় করছেন। অন্যান্য শিল্পীদের অভিনয় যথাযথ।

পটলবাবুর ভূমিকায় অভিনেতা পার্থসারথী দেব।

শব্দরূপ - ৫৫১ **বিমলা পোদ্দার**

■	■	১			২	■	৩
৪	৫		■	■		■	
■		■	৬	■	৭	৮	
■	৯			■	■		■
■		■	■	১০			■
১১		১২	■		■		■
	■		■	■	১৩		
	■	১৪				■	■

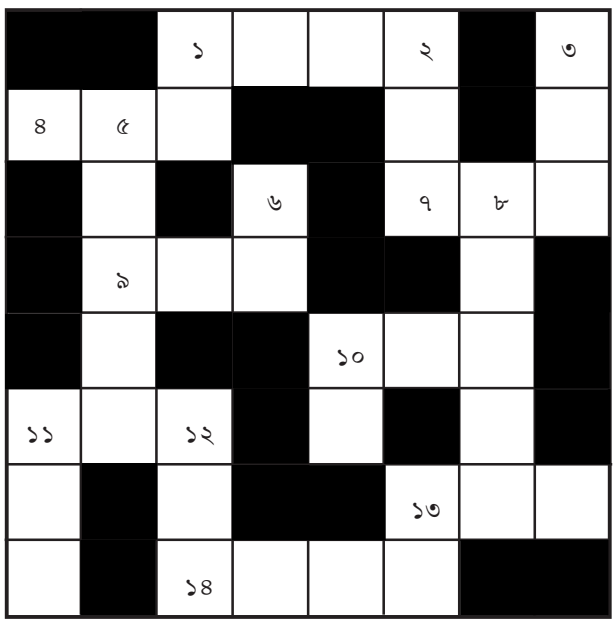

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. এঁর অন্য নাম গরুড়, শেষ দুয়ে ক্ষুধা, ৪. স্ত্রী অর্থে নির্মল, অকলুষিত, ৭. ন্যায়পরায়ণতা, সাধুতা, ৯. শুষ্ক ফুলবিশেষ এক মশলা, প্রথম দুয়ে রামতনয়, ১০. শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্যের উৎপাতের জন্য দেবতারা এই ঋষির আশ্রমে ভগবতীর আরাধনা করেন, প্রথম দুয়ে ঝোলা গুড়, ১১. অর্জুনের ধনু, ব্রহ্মা নির্মাণ করেন, ১৩. তৎসম শব্দে লাউ, ১৪. বাসুকি, দক্ষকন্যা কদ্রুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, এঁর পিতা মহর্ষি কশ্যপ ও ভগিনী মনসা।

উপর-নীচ ঃ ১. তীক্ষ্নপ্রান্ত, ২. শ্রীকৃষ্ণের মাতুল, ৩. দক্ষ প্রজাপতির অন্যতমা কন্যা ও মহর্ষি কশ্যপের স্ত্রী, ৫. সকল বিশ্বের মূলস্বরূপ প্রকৃতি-দেবীর মুখ হতে এই দেবীর জন্ম, ধনপতি সওদাগরের স্ত্রী প্রথম এই দেবীর পূজার প্রবর্তন করেন, ৬. ইনি বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র, এঁর অধিকৃত রাজ্যসমূহ এঁরই নামানুসারে খ্যাত হয়েছে, ৮. ঢেউয়ের পরে ঢেউ, দুয়ে-চারে লক্ষ্মীদেবী, ১০. পাণ্ডুর দ্বিতীয়া স্ত্রী, ১১. ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী ও দুর্যোধনের মাতা, ১২. স্তব, স্তুতি, ১৩. মহারাজ রঘুর পুত্র ও রামচন্দ্রের পিতামহ।

সমাধান শব্দরূপ-৫৪৯

নি	মা	ই	■	■	কু	বে	র
■	■	লা	ক্ষা	ত	রু	■	ঘু
■	উ	■	ল	■	■	■	ব
■	প	ব	ন	■	■	ক	র
বে	ল	■	■	ল	ক্ষ্ম	ণা	■
দ	■	■	■	লি	■	দ	■
ব্যা	■	উ	গ্র	তা	রা	■	■
স	র	মা	■	■	না	গি	নী

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
লক্ষণ বিষ্ণু
সিউড়ি, বীরভূম

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৫১ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৮ জুন, ২০১০ সংখ্যায়

বাংলা সিনেমার দু-চারকথা

অভি মুখার্জী।। হীরালাল সেনের হাত ধরে বাংলা সিনেমার যে পথ চলা শুরু হয়েছিল, পরবর্তীকালে ম্যাডান কোম্পানী, নিউ থিয়েটার্স, এন টি স্টুডিও-র সাহচর্য বাংলা চলচ্চিত্রকে সাবালকত্বে এবং উত্তরণের পথে নিয়ে যায়। হীরালাল সেন, ম্যাডান কোম্পানী, অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন, নিউ থিয়েটার্স আজ ইতিহাস। স্টুডিও সিস্টেমটাই এখন আর নেই। একসময় সিনেমার কাজ শিখতে গেলে স্টুডিওতে ঢুকতে হোত। সেই সময়কার যারা চলচ্চিত্রের প্রবাদ-প্রতিম ব্যক্তিত্ব ছিলেন যেখন প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতিন বসু, সায়গল, পঙ্কজ মল্লিক, বিমল রায় সবাই স্টুডিওতে চাকরী পেয়ে কাজ শিখেছিলেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ষাটের দশক পর্যন্ত এই বাতাবরণটা বজায় ছিল। এখন আর সেটা নেই। এখন যে কোনও মানুষ প্রযোজক ধরতে পারলেই সে পরিচালক হয়ে যায়। সিনেমার পরিচালক হবার এখন বড় যোগ্যতা হলো প্রযোজক ধরা। কাজ বোঝা বা প্রতিভা এগুলি এখন যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি নয়। আগে যে কয়টি ভালো বাংলা ছবি আমরা পেয়েছি তার প্রত্যেকটি ছিল ভালো সাহিত্যিকের লেখা গল্প নিয়ে ছবি। সেইসময় যারা চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন তারাও ছিলেন সুশিক্ষিত সুরসিক। চলচ্চিত্র দর্শকদের মানসিকতাটা তাঁরা বুঝতেন। এখন দেখা যাচ্ছে বাংলা সিনেমা পুরোটাই নকল করে চলছে। মূলত যেসব ছবি দক্ষিণ ভারতে হিট করছে সেগুলিই এখন বাংলায় রিমেক হচ্ছে। দক্ষিণ ভারতে তারা নতুন নতুন গল্প তৈরি করছে। সেই গল্প নিয়ে ছবি করে হিট করছে। আর পশ্চিমবাংলায় যেখানে অলিতে-গলিতে, সর্বত্র বুদ্ধিজীবীতে ছয়লাপ, তাদের জ্ঞান গম্ভীর কথা শুনলে মনে হয়, আহা! কত বোঝদার সব লোক (এই শ্রেণীতে প্রযোজক থেকে অভিনেতা, অভিনেতা থেকে পরিচালক সবাই পড়েন)—কিন্তু তারা মানুষের কাছে একটা সুস্থ সরল স্বাভাবিক গল্প বহুকাল যাবৎ তুলে ধরতে পারছেন না। শুধু টুকলি করে চলেছেন। আবার এক ধরনের পরিচালক আছেন তাদের ছবি বিশেষ শ্রেণীর জন্য। বিশেষ কয়েকটি হলে রিলিজ করে এবং সারাবিশ্বের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ফিল্মোৎসবে দেখানো হয় এবং কখন যে চুপিসারে আসে আর চুপিসারে চলে যায় তা বোঝাও যায় না। সুতরাং একটা অভূতপূর্ব অবস্থার মধ্য দিয়ে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এগিয়ে চলেছে। এর থেকে মুক্তির রাস্তা কি?

মুক্তির রাস্তা একটাই। নিজেদের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। বাংলা সিনেমা দেখতে এখন কোনও ভদ্রলোকের পরিবার প্রেক্ষাগৃহে ঢোকে না। তারা কেন ঢোকে না সেকথা জানতে হবে। যদি তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় কেন তারা বাংলা ছবি দেখছেন না। তখন একটাই উত্তর ভালো লাগে না। কিন্তু ভালো লাগে না কেন যদি জিজ্ঞেস করেন—তখন উত্তর পাবেন, ওগুলো কোনও বাংলা ছবিই নয়! যাই হোক, বিতর্ক বাদ দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের মূল ধারায় আবার ফিরে আসতে হবে। জানতে হবে এর উৎসকে, এর ঐতিহ্যকে। মাটি থেকে সরে গিয়ে ধর্ম-বিশ্বাস-সংস্কৃতি কোনটাই বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না। সুতরাং বাজারী মনোবৃত্তি ত্যাগ করে আগে চলচ্চিত্র শিল্পসত্ত্বাটিকে ভালোবাসতে হবে। তাহলেই মানুষের মন জয় করা যাবে। আবার প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে উঠবে মানুষের ভীড়ে।

মমতাই এখন বিশ্বাসযোগ্য বামপন্থী!

বিদ্যাধর ভট্টাচার্য।। স্বেচ্ছায় যাবেন, না আরও অপেক্ষা করবেন? পুরসভার ভোটে বাংলার মানুষ তাঁর ও তাঁর দলের শাসনের অবসান চেয়ে যে দ্ব্যর্থহীন রায় দিয়েছেন, তারপরে বিপ্লবী কবির বাংলা অনার্স পড়া ভ্রাতুষ্পুত্র কী করেন, এখন একমাত্র সেটাই দেখার। এর পরেও ফেভিকল লাগিয়ে গদিতে বসে থাকলে গণ্ডারও লজ্জা পাবে। ছোট লালবাড়ি গেল, বড় লালবাড়িও যাবার অপেক্ষায় দিন গুণছে। পুরসভার ফলাফল জানিয়ে দিয়েছে ত্রিমুখী, চতুর্মুখী এমনকী কোনও পঞ্চমুখী প্রতিযোগিতা হলেও সিপিএমকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতেই হবে। কংগ্রেসী মুরুব্বিরাও সিপিএমকে রক্ষা করতে পারবেন না। যে বিজেপি-কে বর্বর সাম্প্রদায়িক দল বলে গালাগালি দিতে বামপন্থীরা অভ্যস্ত, শেষপর্যন্ত সেই বিজেপি ভোটারদেরও ভোট ভিক্ষা করতে হলো সিপিএম-কে! বিজেপি ভোটাররা অবশ্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও তাঁর করতে রাজি হননি। নিজেদের ক্ষমতা নিজেরা ধরে রাখতে পেরেছেন। এই পুরনির্বাচনে বিজেপির ক্ষতি হয়নি। অর্থাৎ এই ফলাফল 'মন্দার বাজারেও মন্দ নয়'।

এই নির্বাচন দেখাচ্ছে বামফ্রন্টের বিকল্প মমতা ছাড়া অন্য কেউ নয়। মমতা নিজের সাফল্য ছাড়া অন্য কারও সাফল্য সহ্য করতে পারেন না, মমতা মুসলিম তোষণকারী—সবটাই সত্য। কিন্তু বর্ষার জোয়ারের জল আটকানোর ক্ষমতা যেমন কারও থাকে না তেমন এই মুহূর্তে মমতাকে আটকানোর ক্ষমতা অন্তত এরাজ্যে কারও নেই। অতবড় জ্ঞানেশ্বরী ট্রেন দুর্ঘটনার প্রভাবও পুরভোটে পড়ল না, কারণ মানুষ বুঝে গেছে সিপিএমের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। আজ রাজ্যের সি আই ডি-র জালে জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডে দাপুটে সিপিএম নেতা খগেন মাহাতো। সিপিএমের খাসতালুক মানিক পাড়ার ছানাপাড়া গ্রামের সিপিএমের সক্রিয়কর্মী তিনি। তার স্ত্রী ২০০৩ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। ৩৪ বছরে মানুষ প্রতিটি ঘটনা দেখেছে। সাঁইবাড়ি থেকে লালগড়—সিপিএমের প্রতিটি কীর্তিকলাপ মানুষ মনে রেখেছে। আর দেখেছে একমাত্র মমতাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন, আন্দোলন করেছেন।

সত্তরের দশকে ইন্দিরা গান্ধী দেশে যেমন পরিবর্তনের হওয়া এনেছিলেন, পরবর্তীকালে পরিবর্তনের হাওয়া এনেছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী, পশ্চিমবঙ্গে আজ অনুরূপভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরিবর্তনের প্রতীক। বেশির ভাগ মানুষ বিশ্বাস করেন তিনি সিপিএমের সর্বগ্রাসী দলতন্ত্র থেকে রাজ্যটাকে উদ্ধার করবেন, সরকারি প্রশাসনে আনবেন স্বচ্ছতা, পুলিশকে ফিরিয়ে দেবেন তাদের নিরপেক্ষতা এবং শিক্ষা সংস্কৃতিকে মুক্ত করবেন দলবাজির রাহুগ্রাস থেকে। এর মধ্যে মুসলিম তোষণ সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন নেই কেন? কারণ এ বিষয়ে মানুষ সচেতন নয়। মুসলিমদের সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য সিপিএম কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। সুবিধা পাওয়ার জন্য মুসলিম ভোট সংগঠিত হয়েছে, অপর দিকে হিন্দু ভোট সিপিএম কংগ্রেস তৃণমূল বিজেপিতে ভাগ হয়ে গেছে। প্রতিবাদী

মুসলিমদের সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য সিপিএম কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। সুবিধা পাওয়ার জন্য মুসলিম ভোট সংগঠিত হয়েছে, অপর দিকে হিন্দু ভোট সিপিএম কংগ্রেস তৃণমূল বিজেপিতে ভাগ হয়ে গেছে। প্রতিবাদী হিন্দুভোটকে সংগঠিত করতে গেলে ৩৬৫ দিন যে লড়াইয়ের ময়দানে থাকতে হয় এইবোধ এখনও তৈরি হয়নি।

হিন্দুভোটকে সংগঠিত করতে গেলে ৩৬৫ দিন যে লড়াইয়ের ময়দানে থাকতে হয় এইবোধ এখনও তৈরি হয়নি। কলকাতার বুকে বিজন সেতুতে প্রকাশ্য দিবালোকে কয়েকজন সন্ন্যাসীকে পুড়িয়ে মারার পর আজ পর্যন্ত ক'জন হিন্দু প্রতিবাদ করছে? মুর্শিদাবাদের সীমান্ত অঞ্চলে আক্রান্ত আতঙ্কিত কজন হিন্দুর পাশে আমরা দাঁড়াতে পেরেছি? কেশপুর, গড়বেতায় সিপিএম মুসলিম গুণ্ডাদের হাতে বিরোধীপক্ষের মেয়ে-বৌদের ধর্ষণ নির্যাতনের পর আমরা কজন প্রতিবাদ করেছিলাম? কেবল মমতাকে মুসলিম তোষণকারী হিসেবে চিহ্নিত করেই কি আমরা আমাদের দায়িত্ব শেষ করবো? আর মমতাকে কটূক্তি করলেই কি মুসলিম তোষণ দমানো যাবে! মমতার স্থান পূরণ করতে সিপিএম, কংগ্রেস প্রবল উদ্যোমে এগিয়ে আসবে। তাই প্রয়োজন জনসচেতনতার। মনে রাখতে হবে হিন্দুমহাসভা, জনসঙ্ঘও পশ্চিমবঙ্গে জনমানসে তেমনভাবে দাগ কাটতে পারেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকারের বিকল্প হিসেবে নিজেকে এবং তাঁর দলকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও অন্যান্যরা ব্যর্থ হলো কেন? এই ব্যর্থতার কারণেই কিন্তু মুসলিম তোষণের এত রমরমা। হিন্দুরা যতদিন সংঘটিত হতে না পারবেন, কোনও যোগ্য দল যতদিন না হিন্দুদের জন্য সম্পূর্ণভাবে সচেষ্ট না হবেন ততদিন এরকম চলতেই থাকবে। আমরা খালি আরবের টাকা, পেট্রো ডলার ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করেই দায়িত্ব শেষ করবো। তবে আশার কথা এরকম চিরকাল চলবে না। এখানেও পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও ধীরে ধীরে মুসলিম-ভীতি আসতে আরম্ভ করেছে। সিপিএমের মধ্যে এই ভীতি প্রকটতার লক্ষণ বেশী মাত্রায় ফুটে উঠেছে। আর সে জন্যই বিজেপি ভোটারদের কাছে ভোট ভিক্ষার আবেদন।

মমতার এই জনপ্রিয়তার কারণ কিন্তু তৃণমূলের আদর্শবাদের জন্য নয়। তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহারেও কোনও উন্নয়নমুখী অর্থনীতির কথা বলা হয়নি। কেবল সিপিএম বিরোধিতার জন্যই মমতা এত জনপ্রিয়। সে অর্থে সিপিএম যত ব্যর্থ হবে, গরীব মেহনতি মানুষের থেকে যত দ্রুত সিপিএম সরে যাবে, মমতা তত জনপ্রিয় হবেন। সেদিক থেকে মমতার মূল আদর্শ সিপিএম বিরোধিতা। এখানে তার ধারে- কাছে কেউ নেই। এই সিপিএম বিরোধিতার প্রশ্নেই অনেক হিন্দু মনোভাবাপন্ন মানুষও মুসলিম তোষণকারী জেনেও মমতাকে ভোট দিয়েছেন। মানুষ মনে করেছে প্রথমে সিপিএম বিদায় হোক তারপর অন্য প্রশ্ন। সে লড়াই এখনও শুরুই হয়নি। সে লড়ায়ের জন্য আমাদের সংগঠিত হতে হবে খুব তাড়াতাড়ি।

সমাবেশ সমাচার

সাভারকরের ১২৭-তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন

হলদিয়ার ভবানীপুর থানার দক্ষিণে "সরস্বতী শিশু মন্দির" অঙ্গনে হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে স্বাতন্ত্র্যবীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ১২৭তম জন্ম দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

ওই সভায় সভাপতির পদ অলংকৃত করেন মহাসভার বিশিষ্ট সদস্য পশুপতি দেবনাথ। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হলদিয়া আদালতের আইনজীবী সুজিত কুমার পন্ডা। স্বাধীনতা সংগ্রামে সাভারকরের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার উপর আলোকপাত করেন পশুপতি দেবনাথ ও সুজিত কুমার পন্ডা। দুই প্রধান বক্তা সাভারকরের জীবনাদর্শ ও কর্মপন্থার উল্লেখ করে বলেন যে দেশবাসী বিশেষত যুব সমাজের উচিত এই আদর্শ ও কর্মপন্থা অনুসরণ করা। তারা বলেন, যুবসমাজের আদর্শহীনতাই বর্তমান দেশের দুরবস্থার অন্যতম কারণ।

ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণ বিরোধী কার্যক্রম

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বহরমপুর নগরের পরিচালনায় ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের প্রতিবাদে গ্র্যান্ট হলের সামনে প্রকাশ্য সমাবেশ হয়ে গেল।

শ্রীমতী কৃষ্ণা মৈত্রের কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ গান দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভায় রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক, স্বপন ভৌমিক, উত্তম দাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ বক্তব্যের মধ্যে সংরক্ষণের ফলে সমাজের ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরেন। তাঁরা এর ফলে আবার দেশভাগের আশঙ্কা প্রকাশ করেন। সুনীল সিংহ সমাপ্তি ভাষণ দেন। নগর সভাপতি সৌমেন্দ্রনাথ মুখার্জী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শঙ্কর ভট্টাচার্য।

* * *

শোক সংবাদ

মালদা জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ তথা ক্রিকেট মাঠের আম্পায়ার পুষ্পেন চৌধুরী গত ১ জুন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। তিনি ক্রীড়াভারতীর দায়িত্বে ছিলেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। এই ক্রীড়া-ব্যক্তিত্বের হাত ধরে বহু খেলোয়াড় তৈরি হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

* * *

মালদা জেলার বিজেপি নেতা বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী (বালুদা)-র দিদি বিজয়া চক্রবর্তী গত ২০ মে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

শীতলা ও রক্ষাকালী পূজা

মোসিনপুর বারোয়ারী সমিতি কর্তৃক গত ২৯ মে, মেদিনীপুর বিন্দুবাসিনী শীতলা মন্দিরে প্রতি বৎসরের ন্যায় শীতলা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বাইরে থেকে বহু ভক্ত মায়ের পূজায় অংশগ্রহণ করেন।

সন্ধ্যার সময় মন্দির প্রাঙ্গণে অন্ন ভোগের ব্যবস্থা হয়। সন্ধ্যায় পূজার পর মা শীতলার পালা গান অনুষ্ঠিত হয়। কালীঘাট থেকে আগত দলের পালাগান ভক্তদের মুগ্ধ করে। রাত্রি ১২টার পর রক্ষাকালী পূজা হয়। চাল কুমড়া বলি হয় রাত্রি চার ঘটিকায়। রক্ষাকালীর বিসর্জনের উদ্দেশ্য যাত্রা করে।

১২৫৮ সালে স্থাপিত এই দেবস্থান ওইদিন তীর্থস্থানে পরিণত হয় ও মেলা বসে। বিভিন্ন পূজার অঙ্গ হিসাবে মেদিনীপুরে এই দেবস্থান অতুলনীয়।

মঙ্গলনিধি

গত ৫ জুন বীরভূম জেলার বীরনগরী গ্রামের বাসিন্দা এবং প্রাক্তন বিদ্যালয় শিক্ষক সুবোধ চন্দ্র দে তাঁর একমাত্র পুত্র মৃণালকান্তি দে'র বিবাহ উপলক্ষে প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে সমাজসেবার জন্য ১০০১ টাকা প্রদান করেন। তিনি দক্ষিণ অসম প্রান্তের সহ-ব্যবস্থা প্রমুখ হরিসাধন কোনারের হাতে ওই অর্থ প্রদান করেন। শ্রী দে, তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ এবং গ্রামের স্বয়ংসেবকেরা মঙ্গলনিধি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

Swastika
14 June - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

মালদার আম

তরুণ কুমার পণ্ডিত।। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ফলের মধ্যে আম সকলের সেরা। স্বাদে ও গুণে অন্য ফল আমের সমান নয় বলে একে ফলের রাজা বলা হয়। পৃথিবীতে সব থেকে সুস্বাদু আম এখন ভারতেই হয়। ভারত যতরকম ফল পৃথিবীকে খাওয়ায় তার মধ্যে সব থেকে বেশী চাহিদা এই আমের। আম আমাদের 'জাতীয় ফল'। আমের জন্মস্থান আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষে। পরে এখান থেকে আম অন্যান্য দেশ যেমন, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াতে চলে যায়। পশ্চিমবঙ্গ আম উৎপাদনে দেশের চতুর্থস্থানে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে জেলাগুলির মধ্যে মালদা, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়াতে আমের চাষ হয়। তবে মালদা জেলাতেই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সব চেয়ে বেশী জমিতে আম চাষ হয়। মালদাতে এবারে ২৬ হাজার হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়েছে। গত বছর জেলাতে ১,৫০,০০০ মেট্রিক টন পর্যন্ত আম উৎপাদন হয়েছে। এবারে জেলাতে তিন লক্ষ মেট্রিক টন আম উৎপাদনের সম্ভবনা রয়েছে। গত ডিসেম্বর মাসে আবহাওয়া অনুকুল থাকার জন্য আম গাছগুলিতে প্রচুর মুকুল হয়েছিল। কিন্তু পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ার জন্য এবং শিলাবৃষ্টিতে ৫০ শতাংশ মুকুল নষ্ট হয়ে গেলেও উৎপাদন ভালই হবে বলে মনে করছেন আম চাষীরা।

মালদাতে যে সব জাতের আম পাওয়া যায় সেগুলি হলো—গোপালভোগ, ল্যাংড়া, হিমসাগর, জিলিপি কাঁড়া, ফজলী গুঠি, লক্ষণভোগ ও আম্রপালী। আম গাছের একটা সমস্যা, নিয়মিত প্রতিবছর ফুল ও ফল আসে না। গত বছর আমের ফলন খুব ভাল ছিল না। এবছর আমের মুকুল কম আসার কথা ছিল, কিন্তু তা না হয়ে এবার ফলন গত বছরের চেয়ে বেশী হয়েছে। বিদেশের বাজারে আলফানসো,

ল্যাংড়া, লক্ষণ ভোগ ও আম্রপালী আমের চাহিদা যথেষ্ট রয়েছে। যেহেতু ইউরোপের মানুষ বেশি মিষ্টি আম পছন্দ করেন না তাই লক্ষণ ভোগ কম মিষ্টি হওয়ায় এই আমের রপ্তানী এবার বেড়েছে বলেই মনে করছে রপ্তানীকারকগণ। আনন্দের কথা, এবারই প্রথম মালদার আম বৃটেন ও আরব দুনিয়াতে রপ্তানি করতে তৎপর হয়েছে জেলা উদ্যান পালন দপ্তর। শোনা যাচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর মাতাতে যাচ্ছে মালদার লক্ষণ।।

ভোগ ও হিমসাগর আম। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে গোপাল ভোগ ও জিলিপি কাঁড়া আম বাজারে এসেছে। জিলিপিকাঁড়া আমটি স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়। কিন্তু এই আমটি ইংলিশ বাজার ব্লকের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। ফলে সবাই এই আমের স্বাদ অনুভব করার সুযোগ পায় না। আমকে কেন্দ্র করে তেমন কোনও বড় শিল্প মালদাতে এখনও পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। অথচ ঝড়ের পর প্রচুর আম বাগানে নষ্ট হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, মালদা জেলাতে আমগাছে যতক্ষণ আম ধরে থাকে ততক্ষণ তার মালিক জমি যার তার। কিন্তু ঝড়ে সেই আম মাটিতে পড়ে গেলেই তখন তার মালিক হন সর্বসাধারণ। তাই এই আমের সময়ে গরীব মানুষরা ঝড়ের অপেক্ষায় থাকে। তাছাড়া আম পেকে গেলে আম পাড়ার জন্য যে সব শ্রমিক যাবে তারা পাকা আম যতটা পাড়বে বস্তা ভর্তি করে নিতে পারবে, পারিশ্রমিক আলাদা পাবে। মালদা জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল আম। এই জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকাংশে আমের উপর নির্ভরশীল। আমের মরশুমে ৩০-৪০ শতাংশ লোক আম বাগানে বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকে। ঘরে আমসত্ব ও আচার তৈরী করেও কিছু মানুষ উপার্জন করে থাকেন। আগে মালদার আম বলতে ফজলিকেই বোঝাত। প্রায় ৭০ শতাংশ বাগান ছিল ফজলির। এখন বিভিন্ন কারণে 'ফজলি'র চাষ কমেছে। বর্তমানে ৩৮ শতাংশ এলাকায় ফজলি আম চাষ হয়। এখন চাষ বাড়ছে হিমসাগর, ল্যাংড়া ও লক্ষণভোগের। ল্যাংড়া আমের চাহিদা ও দাম সবচেয়ে বেশী। যে বছর আমের ফলন কম বা 'অফ ইয়ারে' ল্যাংড়া আমের দাম ২,০০০—২৫০০ টাকা কুইন্টাল হয়। প্রচুর ফলন হলে অবশ্য দাম কমে—১৩০০ থেকে ১৫০০ টাকা কুইন্টাল হয়ে যায় যা অন্যান্য আমের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। লক্ষণ ভোগ আমটি পাকার সময়ে ভীষণ আকর্ষণীয় রংয়ের হয়। আমের বোঁটা খুব শক্ত, ঝরে কম। রোগ পোকা আক্রমণ কম হয়। পাকা আম গাছে অনেকদিন রাখা যায়। গাছ থেকে পাড়ার পর অন্যান্য আম ৭ দিন থেকে ১০ দিনের বেশি রাখা যায় না। কিন্তু লক্ষণ ভোগ আম দুই সপ্তাহেরও বেশী ভালভাবে রাখা যায়। আর প্রতিবছর কম বেশী ফলন হয়। তাই বিদেশ ও দেশের বাজারে লক্ষণ ভোগের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। আশ্বিনা নামে নাবি জাতের আর একটি আম মালদাতে ফজলির পরে পাকে। আকারে বেশ বড়। এই আম থেকে উৎকৃষ্ট মানের আচার তৈরী হয়। রোগের প্রকোপের জন্য ক্ষীরসাপতি বা হিমসাগর আমটি এখন খানিকটা জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। এছাড়া কৃষ্ণভোগ, সীতাভোগ, অমৃতভোগ, ভাদুরিয়া, রাখালভোগ, মিছরিকান্ত প্রভৃতি আমের জাত কেবল মালদাতেই পাওয়া যায়। মালদা জেলাজুড়ে আম্রপালি আম বাগানের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। যেহেতু এই গাছ অল্প দূরত্বে লাগান যায় এবং পাঁচ বছরের মধ্যেই ফল দেওয়ার ক্ষমতা রাখে সেইজন্য জমির মালিক এখন বড় অনেক দিনের গাছ কেটে আম্রপালী আম গাছ লাগাচ্ছে। জীবিকা হিসাবে মালদাতে ফল হিসাবে আম এখন দাপটে রেখেছে। বাগান মালিকরা মুকুল আসার আগেই বিক্রি করে নিশ্চিন্তে ঘুমোন। ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশেও আম রপ্তানী করে থাকে, বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আনেন।

প্রকাশিত হবে ৫ জুলাই '১০
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হবে ৫ জুলাই '১০
তথ্যসমৃদ্ধ ও মননশীল বিভিন্ন রচনা নিয়ে এবারের
শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যা
হিন্দুত্বের প্রহরী
সুলতানী আমল থেকে ইংরেজ আমল অথবা স্বাধীন ভারতবর্ষ– হিন্দুর নির্যাতন বন্ধ হয়নি। নির্যাতিত আতঙ্কিত হিন্দুকে কালে কালে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছেন একেক জন মহান পুরুষ। প্রণবানন্দ, সাভারকর, শ্যামাপ্রসাদ, ডাক্তারজী, বিপিনচন্দ্র পাল– এরকম ব্যক্তিত্বরাই তো ছিলেন হিন্দুত্বের প্রহরী। এঁদের স্মৃতিতর্পণে সাজানো এবারের শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যার অনবদ্য সম্ভার। সঙ্গে থাকছে তাঁর পৈত্রিক বাড়ি নিয়ে বহু অজানা তথ্য।
।। রঙিন প্রচ্ছদ।। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ঃ ছয় টাকা।।
১৯ জুনের মধ্যে কপি বুক করুন।

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম ত্রর ..... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com